রাসুল মুহাম্মাদ (স:) এর মুযেজা

মুল : হারুন ইয়াহিয়া , তুরস্ক
অনুবাদ: জাবীন হামিদ , বাংলাদেশ

সুচি

১. ভুমিকা

২. নবী হওয়ার আগেই হযরত মুহাম্মাদ (দ:) কে আল্লাহ যে মুযেজা দান করেছিলেন

৩. অলৌকিক ওহী

৪. অলৌকিক কুরআন

৫. হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর অসাধারণ মহৎ চরিত্র -- এটাও এক মুযেজা

৬. হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর জীবনের কিছু মুযেজা

৭. হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর দোয়ার বরকত

৮. অলৌকিকভাবে আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:) – কে রক্ষা করেন

৯. অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাসুল (দ:) কে দেয়া হয়

১০. উপসংহার

টীকা

১. ভুমিকা

মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দিতে , মানুষ যেন এই দুনিয়ায় ও মৃত্যুর পরের জীবনে কল্যাণ লাভ করতে পারে , সেজন্য আল্লাহ যুগে যুগে সব জাতির কাছে নবী পাঠিয়েছেন ।

কুরআনে বলা হয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য এটা আল্লাহর তরফ থেকে অসীম দয়া : "আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে , তিনি তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে তাদের কাছে রাসুল পাঠিয়েছেন , যে আল্লাহর আয়াত তাঁদের কাছে তিলাওয়াত করে , তাদেরকে শুদ্ধ করে ও পবিত্র কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় ; যদিও তারা ছিল সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে "। (সুরা ইমরান; ৩:১৬৪)

আল্লাহ তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (দ:) কে বলেন : " আমি তোমাকে পুরো বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসাবে পাঠিয়েছি " (সুরা আম্বিয়া , ২১ : ১০৭)

এই সব নবী ও রাসুল (দ:) নিজ নিজ জাতিকে সত্যের আলো দেখাতেন ; তাঁরা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান ও আল্লাহর নির্দেশ জানাতেন । দুনিয়ার পরবর্তী জীবনের জন্য নবী ও রাসুলগন আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর হুকুম মেনে চলার গুরুত্ব সবার কাছে পৌঁছে দিতেন। আল্লাহর তরফ থেকে আসা এই নবীদের আগমণের উপকারীতা খুব কম মানুষই বুঝতে পেরেছিল।

কুরআনে বলা হয়েছে : "....বেশীরভাগ মানুষই ঈমান আনলো না " (সুরা রাদ , ১৩: ১) । " তুমি যতই চাও না কেন , বেশীরভাগ মানুষই বিশ্বাসী নয় " (ইউসুফ , ১২ : ১০৩)

নবীদের একটিই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল --- আল্লাহর বাণী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া। তাঁরা মানুষের কাছ থেকে কোন টাকা -পয়সা বা জাগতিক লাভ চাইতেন না। আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁদের কাম্য । তাঁরা ছিলেন মহৎ চরিত্রের অধিকারী ও প্রকৃত আল্লাহভীরু।

আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে জাগতিক কোন লাভ তো তাঁদের হয়-ই নি বরং নানা ধরণের বিপদ-আপদের মুখোমুখি হয়েছেন তাঁরা। এসব বিপদ তাঁদের ঈমানকে আরো মজবুত করেছে।

নবীদের এই আত্মত্যাগ , বিশ্বস্ততা , দৃঢ়চিত্ততা , আন্তরিকতা ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের প্রতিদানে আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করেছেন । কুরআনে বলা আছে : " এটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত : আমি অবশ্যই বিজয়ী হবো ও আমার রাসুলরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান , পরাক্রমশালী " (সুরা মুজদালাহ ; ৫৮ : ২১)

আল্লাহ বিশ্বাসীদের উপর তাঁর রহমত বাড়িয়ে দেন ও বিপদ মুক্তির উপায় করে দেন। কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাঁদের সাহস ও শক্তি বাড়ান , তাঁদের বোঝা হালকা করে দেন ও আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁদের মনোবল দৃঢ় করেন।

নবী ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ যেভাবে সাহায্য ও রক্ষা করেন , তা কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে--- " নিশ্চয়ই আমি রাসুলদের ও মু'মিনদের সাহায্য করবো এই দুনিয়ায় ও সেদিন যেদিন সাক্ষীরা দাড়াবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে) " (সুরা মু'মিন / গাফির ; ৪০ : ৫১)।

আল্লাহ কিছু রাসুলকে অলৌকিক কাজ করার শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন। অলৌকিকত্ব বা মুযেজা সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর এক চ্যালেঞ্জ। এটা এমন এক ব্যপার যা মানুষ নিজের শক্তিতে করতে পারে না । এটা শুধুমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই হতে পারে।

মুযেজা হলো এমন এক অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক ব্যপার যা মানুষের উপর প্রচন্ড প্রভাব ফেলে। এর দুই রকম প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ।

১. যারা বিশ্বাসী তাঁদের ঈমান বৃদ্ধি পায়
২. অনেক অবিশ্বাসী ঈমান আনে।

যারা মুযেজায় বিশ্বাস করতো না , তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয় একই ধরণের কিছু করে দেখাতে । যখন তারা তা পারলো না , তখন আল্লাহর কালামে তা প্রকাশিত হয় ও অবিশ্বাসীদের ব্যর্থতা উন্মোচিত হয়।

আল্লাহ যে মুযেজা রাসুলদের দান করেছিলেন –

নবী ও রাসুলদের জীবনের অনেক ঘটনা বিস্তারিতভাবে কোরআনে বলা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন মুযেজা যার মাধ্যমে আল্লাহ তাদের ঈমানকে দৃঢ় করেছেন , তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ও অবিশ্বাসীদের থেকে মুযেজার মাধ্যমে তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

মুযেজাপ্রাপ্ত নবী ও রাসুলদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত ইবরাহীম , মুসা , ঈসা ও মুহাম্মাদ (দ:)।
নীচে কিছু মুযেজার বর্ণনা দেয়া হলো :

হযরত ইবরাহীম (আ:) এর মুযেজা–

যে আগুনে ইবরাহীম (আ:) কে ছুঁড়ে ফেলা হয় , সেই আগুন তাঁকে না পুড়িয়ে বরং শীতল হয়ে গিয়েছিল ।
মুর্তি পুজারীরা ইবরাহীম (আ:) এর উপর খুবই রেগে গিয়েছিল ; কারন , তিনি মুর্তিদের সমালোচনা করতেন । সেজন্য মুর্তি উপাসকরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে আগুনে ফেলে দেয়। কিন্তু আল্লাহ মুযেজার মাধ্যমে তার এই নবীকে রক্ষা করেন। কোরআনে আল্লাহ জানান – তাঁরই আদেশে আগুন ইবরাহীম (আ:) এর কোন ক্ষতি করে নি-- " আমি বললাম : হে আগুন ; তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও "
(সুরা আম্বিয়া , ২১ : ৬৯)

যে পাখিকে ইবরাহীম (আ:) কেটে টুকরো টুকরো করেন , সেই পাখি তাঁর কাছে জীবিত ফেরত আসলো : " যখন ইবরাহীম বললো , হে আমার পালনকর্তা , আমাকে দেখান কিভাবে আপনি মৃতকে জীবিত করবেন। আল্লাহ বললেন : তুমি কি বিশ্বাস করো না ? ইবরাহীম বললো , অবশ্যই বিশ্বাস করি , তবে দেখতে চাচ্ছি মনের প্রশান্তির জন্য । আল্লাহ বললেন : তবে চারটি পাখি ধরে পোষ মানাও। তারপর তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন পাহাড়ে রাখো। এরপর ওদের ডাকো ; তারা দ্রুত তোমার কাছে চলে আসবে। " (সুরা বাকারা , ২: ২৬০)

হযরত মুসা (আ:) এর মুযেজা –

আল্লাহ যে মুযেজা মুসা (আ:) কে দান করেছিলেন , তা তিনি ব্যবহার করেছিলেন ফেরাউন ও তার পরিষদকে সত্য পথের দাওয়াত দিতে---" ফেরাউন বললো , যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাকো , তবে সত্যবাদী হলে তা দেখাও । তখন মুসা তার লাঠি ছুড়ে দিলো ও সাথে সাথে তা অজগর হলো"
(সুরা আরাফ ; ৭: ১০৬–১০৭)

মুসা (আ:) এর লাঠি পরিণত হয় বিশাল এক সাপে (অজগরে) ও যাদুকরদের সব সাপকে তা গিলে খায় ---" তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ করো ; এটা ওরা যা করেছে

সেটাকে খেয়ে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল ; যাদুকররা যেখানেই থাকুক , সফল হবে না । ”
(সুরা তা – হা ; ২০ : ৬৯)

মুসা (আ:) হাত বরফের মতো সাদা হতো– “ তোমার হাত বগলে ঢুকিয়ে চাপ দাও । এটা সম্পুর্ণ সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে যা একটি নিদর্শন। এভাবে আমি তোমাকে আমার সেরা কিছু নিদর্শণ দেখাবো । ” (সুরা তা– হা , ২০ : ২২–২৩)।

ফেরাউনের কাছ থেকে মুসা (আ:) ও বনী ইসরাইলরা পালিয়ে যায়। মুযেজার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদেরকে অক্ষত পালাতে সাহায্য করেন। অন্যদিকে ফেরাউন দলবলসহ ডুবে যায় পানিতে।

মুসা (আ:) লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন ও সমুদ্রের মধ্যে তাঁর জন্য পথ বের হয় : “ যখন দুই দল একে অন্যকে দেখলো , তখন মুসার সাথীরা বললো , আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা বললো : কখনো না। আমার সাথে আমার প্রভু আছে ; তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর আমি মুসার কাছে ওহী পাঠালাম : তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে সমুদ্র দুই ভাগ হয়ে উঁচু পাহাড়ের মত হয়ে গেল। আমি অন্য দলকে সেখানে আনলাম ও উদ্ধার করলাম মুসা ও তাঁর সাথীদের এবং পানিতে ডুবিয়ে অন্য দলকে (সুরা শু’আরা ; ২৬: ৬১–৬৬)

হযরত ইউনুস (আ:) এর মুযেজা–

মাছ গিলে ফেলার পর অলৌকিকভাবে ইউনুস (আ:) রক্ষা পান ---“ ইউনুসও ছিল রাসুলদের একজন। যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গেল ও লটারীতে দোষী সাব্যস্ত হলো , এরপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলে ও সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করতো , তবে কেয়ামত পর্যন্ত তাঁকে মাছের পেটেই থাকতে হতো ; তারপর আমি ওকে নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে , সে ছিল তখন রুগ্ন ” (সুরা সাফফাত ; ৩৭ : ১৩৯–১৪৫) ।

হযরত যাকারিয়া (আ:) এর মুযেজা –

অতি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভের সুখবর পান তিনি--- “ ...যাকারিয়া তার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলো : হে আমার প্রভু; আমাকে তুমি তোমার কাছ থেকে সৎ বংশধর দান করো। নিশ্চয়ই

তুমি প্রার্থনা শুনে থাকো। যখন যাকারিয়া সালাতে দাড়ালেন , তখন ফিরিশতা তাকে ডেকে বললো : আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সুখবর দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক , নেতা , স্ত্রী বিরাগী ও পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। " (সুরা ইমরান ;৩: ৩৮-৪০)

মারইয়াম (আ:) কে যে মুযেজা দান করা হয়েছিল - সবসময়ই তাঁর কাছে খাবার থাকতো --- " ...যখনই যাকারিয়া কামরায় মারইয়ামের সাথে দেখা করতে যেতেন , তখনই তার কাছে খাবার দেখতেন; যাকারিয়া বলতেন : হে মারইয়াম ; এ সব তুমি কোথায় পেলে ? সে বলতো : এসব আল্লাহর কাছ থেকে । নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন। "(ইমরান; ৩: ৩৭)

ঈসা (আ:) এর মুযেজা-

জন্ম মুহূর্ত থেকে শুরু করে সারা জীবন ধরেই ঈসা (আ:) কে মুযেজা দান করা হয়। এ সবের বিস্তারিত বর্ণনা কোরআনে দেয়া হয়েছে। " যখন আল্লাহ বলবেন , হে ঈসা ইবনে মারইয়াম ; তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করো। পবিত্র আত্মা দিয়ে আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম । তুমি মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সেও মানুষের সাথে কথা বলতে ; আর আমি তোমাকে শিখিয়েছিলাম কিতাব , হেকমত , তাওরাত ও ইন্‌জীল।

তুমি কাদা মাটি দিয়ে আমার আদেশে পাখি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতে ; আর আমার আদেশে তা পাখি হয়ে যেত। আমার আদেশে তুমি জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে ।

তুমি আমার আদেশে মৃতকে (কবর থেকে) বের করে নিয়ে আসতে ; আমি বনী ইসরাইলকে নিবৃত্ত করেছিলাম যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমান নিয়ে গিয়েছিলে আর তাদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা বলেছিল :এ তো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় (সুরা মায়িদা; ৫ : ১১০) ।

" আর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (ঈসাকে) শিখাবেন কিতাব , হেকমত , তাওরাত ও ইন্‌জীল ; ও তাঁকে বনী ইসরাইলের জন্য রাসুল হিসাবে মনোনীত করবেন।

সে বলবে : আমি তো তোমাদের কাছে এসেছি তোমার প্রভুর কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে। তা এই , আমি কাদা মাটি দিয়ে পাখি বানিয়ে ফুঁ দিবো । এরপর আল্লাহর হুকুমে তা জীবন্ত পাখি হয়ে

যাবে। আমি আল্লাহর আদেশে ভাল করে তুলবো জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে ও মৃতকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমি তোমাদের বলে দেব তোমরা কী খাও ও কী ঘরে মজুদ রেখেছো।

নিশ্চয়ই এসব হলো নিদর্শন যদি তোমরা বিশ্বাসী হও " (সুরা ইমরান; ৩: ৪৮-৪৯)।

উপরে উল্লেখিত মুযেজা ছাড়াও আরো বেশ কিছু মুযেজার কথা কুরআনে বলা হয়েছে । এসব মুযেজাই আল্লাহর আদেশে এবং তিনি যেভাবে চেয়েছেন সেভাবেই হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন , " আমি তোমার { মুহাম্মাদ (দ:) } আগে অনেক নবী , রাসুল পাঠিয়েছি ও তাঁদেরকে স্ত্রী , সন্তান দিয়েছি; কোন রাসুলেরই এই ক্ষমতা ছিল না যে আল্লাহর আদেশ ছাড়া কোন আয়াত হাজির করবে । নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট বিধি রয়েছে।" (সুরা রাদ; ১৩: ৩৮)

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ। তাঁর সব কথা , কাজ , দৃঢ় ঈমান ও সৎ স্বভাব এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ পুরো মানবজাতির জন্য রাসুল (দ:) কে উত্তম আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আগের অনেক নবী ও রাসুলদের মতো হযরত মুহাম্মাদ (দ:) ও আল্লাহর অনুমতি নিয়ে বেশ কিছু মুযেজা দেখান --যেন মানুষ মুযেজা থেকে শিখতে পারে । কিছু মুযেজা শুধুমাত্র রাসুল (দ:) এর সাথীরাই দেখেছেন , অন্য মুযেজা অবিশ্বাসীরাও অনেকেই দেখেছে।

এ ধরণের কিছু মুযেজার কথা কুরআনে এসেছে। অন্যগুলির কথা হাদীস ও ইসলামী চিন্তাবিদদের বর্ণনায় আছে। এ সব তথ্য থেকে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত রাসুল (দ:) -- যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছেন --তাঁর বিভিন্ন মুযেজার কথা জানা যায়। এছাড়াও আমাদের জীবনে কুরআন ও হাদীসের গুরুত্ব সম্পর্কেও আমরা বুঝতে পারি।

২। ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় , রাসুল (দ:) চল্লিশ বছর বয়সে নবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তবে ওহী লাভ আগেই বেশ কিছু ঘটনা ঘটে যা ভবিষ্যতে তাঁর নবী হওয়ার ইশারা দেয়।

রাসুল (দ:) এর জন্মের সময় দাই-মা ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফের মা আশ-শিফা। তিনি বলেন , রাসুল (দ:) যখন তার হাতে জন্মান ও হাঁচি দেন ,

তখন তিনি স্পষ্ট শুনতে পান কেউ একজন বলছে -- আপনার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক্। তিনি আরো বলেন , পুরো পৃথিবী যেন আলোকময় হয়ে গিয়েছিল (আবু নায়ীম)।

রাসুল (দ:) যখন পথ চলতেন , তখন সবসময় তাঁর উপর ছায়া থাকতো। রাসুল (দ:) এর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজা (র:) বলেন , তিনি দেখেছিলেন দু'জন ফিরিশতা তাঁর স্বামীকে পথ চলার সময় ঢেকে রেখেছিলেন (ইবনে সাদ)।

রাসুল (দ:) এর দাই - মা বণী সাদ ইবনে বাকর গোত্রের বিবি হালিমা বলেন , নবী (দ:) যখন তার সাথে ছিলেন , তখন তিনি দেখেছেন মেঘ তাঁকে সবসময় ছায়া দিতো।

এক সফরে রাসুল (দ:) বিশ্রাম নেয়ার জন্য এক শুকনো গাছের নীচে বসেন। গাছটি সতেজ হয়ে বেড়ে উঠে ও প্রচলিত বর্ণনা মতে গাছের ছায়া বেড়ে গিয়ে রাসুল (দ:) কে ঢেকে রাখে । গাছটির আশেপাশের গাছগুলিও সতেজ , সবুজ হয়ে উঠে।

নবী হওয়ার সময় যখন কাছেই , তখন হযরত (দ:) স্বপ্নে যা দেখতেন , তা-ই সত্য হতো। হাদীস থেকে জানা যায় , প্রায় ৬ মাস পর্যন্ত হযরত (দ:) এ ধরণের স্বপ্ন দেখেছেন । বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল বুখারী এ সব স্বপ্নের বিবরণ তার বইতে দিয়েছেন। আয়েশা (র:) বলেন , ওহী নাজিল হওয়ার সময় যখন এসেছিল তখন হযরত (দ:) সবসময়ই স্বপ্নে যা দেখতেন তা সত্য হতো। এমনটি কখনো হয় নি যে তিনি ঘুমের মধ্যে বা স্বপ্নে যা দেখেছেন তা ঘটে নি। (বুখারী)

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে হযরত (দ:) এর এ ধরণের স্বপ্ন দেখার কারণ হলো রাসুল হওয়ার গুরু দায়িত্ব বহনের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছিলো।

৩. অলৌকিক ওহী

হযরত (দ:) কে আল্লাহর তরফ থেকে যে সব মুযেজা দান করা হয় , নি:সন্দেহে সে সবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো পবিত্র কুরআন।

আল্লাহ মানবজাতির কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত (দ:) কে নির্বাচিত করেন। এটি ছিল এক বিরাট দায়িত্ব যে সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে -- " " হে চাদরে ঢাকা রাসুল ;

রাতে নামাজ পড়ো – কিছু সময় বাদ দিয়ে – রাতের অর্ধেক বা এর কিছু কম বা বেশী ; কুরআন তেলাওয়াত করো স্পষ্টভাবে। আমি তোমার কাছে পাঠাবো গুরুত্বপুর্ণ বাণী ; রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠার জোরালো প্রভাব রয়েছে -- তা মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। দিনের বেলা তোমার অনেক কাজ থাকে । তুমি তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো ও তাঁর প্রতি পরিপুর্ণভাবে আত্মনিবেদন করো " (সুরা মুজাম্মেল; ৭৩ : ১-৮)।

ওহী : স্বপ্ন সত্যি হওয়ার ঘটনা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ওহী নাজিল হলো । স্বপ্ন দেখার পর থেকে হযরত (দ:) জাবল-এ -নুর পাহাড়ের হেরা গুহায় গিয়ে ধ্যান করা শুরু করলেন।

এই পাহাড়টি মক্কা থেকে ১২ কিলোমিটারের দুরে। এক রমজান মাসে হযরত (দ:) যখন হেরা গুহায় একা , তখন জিবরাইল (আ:) তাঁকে দেখা দিয়ে আল্লাহর আদেশ শোনালো- পড়ো। হযরত (দ:) এর বয়স তখন ৪০ ।

এই ঘটনাগুলি হাদীসে বিস্তারিতভাবে এসেছে-

আয়শা (র:) বলেন- ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন দেখা শুরুর পরেই ওহী নাজিল হয়। হযরত (দ:) হেরা গুহায় গিয়ে রাতের পর রাত আল্লাহর ধ্যান করতেন। তিনি কিছু খাবার সাথে করে নিয়ে যেতেন। সেগুলি ফুরিয়ে গেলে তিনি বাড়ি ফিরে বিবি খাদিজা (রা:) এর কাছ থেকে আবারো কিছু খাবার নিয়ে গুহায় ফিরে যেতেন ।

এমনই এক সময়ে হেরা গুহায় হঠাৎ করে সত্যের বাণী তাঁর উপর নাজিল হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে পড়তে বললো । হযরত (দ:) জানালেন - আমি পড়তে পারি না।

হযরত (দ:) পরে বলেন , তখন ফিরিশতা আমাকে ধরে সজোরে চাপ দেয় । যখন সেই চাপ আর সহ্য হচ্ছিলো না , তখন ফিরিশতা ছেড়ে দিয়ে আবারো বললো - পড়ো। আমি আবারো বললাম , আমি তো পড়তে পারি না। ফিরিশতা তখন আবার আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলো । যখন আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না , তখন ফিরিশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে আবারো পড়তে বললো। আমি আবারো বললাম - আমি পড়তে পারি না অথবা আমি কী পড়বো ?

তখন ফিরিশতা তৃতীয়বারের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিয়ে বললো : পড়ো , তোমার প্রভুর নামে , যিনি সৃষ্টি করেছেন ; সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে ; পাঠ করো আর তোমার রব খুবই দয়ালু , যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে, তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না ---- (সুরা আলাক; ৯৬ : ১-৫) ।

এরপর আল্লাহর রাসুল (দ:) ওহী নিয়ে ফিরে আসলেন (বুখারী)।

নবীর (দ:) কাছে ওহী নাজিল ও জিবরাইল (আ:) এর সাথে দেখা হওয়ার ঘটনা কুরআনের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে। যেমন , "... তোমাদের সাথী পথভ্রষ্ট বা বিপদগামী নয় ; সে খেয়াল খুশীমতো কথা বলে না । এ কুরআন ওহী ছাড়া আর কিছুই নয় যা তাঁকে শেখায় এক শক্তিশালী সত্ত্বা। সে (ফিরিশতা) স্থির হয়ে ছিলো -- সর্বোচ্চ দিগন্তে--এরপর ফিরিশতা কাছে আসলো ; তাদের { মুহাম্মাদ (দ:) ও জিবরাইল (আ:) মধ্যে দুরত্ব ছিল দুই ধনুকের ব্যবধান বা তার চেয়েও কম । তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন।

" সে যা দেখেছে তাঁর হৃদয় সে সম্পর্কে মিথ্যা বলে নি। তবে কি তোমরা সে যা দেখেছে তা নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করবে ? " (সুরা নাজম; ৫৩ : ২-১২;)।

কুরআনের ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে কারো কারো মতে এই আয়াতগুলিতে ওহী নাজিলের কথা বলা হয়েছে। আবার কারো মতে , এটা শবে মেরাজে আল্লাহর সাথে রাসুল (দ:) এর দেখা হওয়ার ঘটনা।

আরো কিছু আয়াত আছে যাতে এই সত্যতার সমর্থন পাওয়া যায় যে জিবরাইল (আ:) আল্লাহর তরফ থেকে কুরআন নবীর (দ:) কাছে নিয়ে আসেন। এই সব আয়াতে জিবরাইল (আ:) কে বলা হয়েছে পবিত্র বা বিশ্বাসী আত্মা : " তুমি বলে দাও : যে কেউ জিবরাইলের শত্রু -- এজন্য যে , সে আল্লাহর আদেশে তোমার অন্তরে কুরআন নাজিল করে , যা আগেকার কিতাবের সত্যতার সমর্থক ও মু'মিনদের জন্য পথ - প্রদর্শক ও সুসংবাদ দানকারী ....." (বাকারা ; ২:৯৭;) । " বলো : পবিত্র আত্মা তোমার রবের কাছ থেকে সত্যসহ কুরআন নিয়ে আসে ; যারা মু'মিন তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য ও মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও সুসংবাদ হিসাবে "
(সুরা নাহল; ১৬ : ১০২) ।

" সত্যিই এই ওহী আসে জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে। বিশ্বাসী আত্মা এটা নিয়ে আসে তোমার অন্তরে যাতে তুমি সতর্ককারীদের একজন হতে পারো "(সুরা শুয়ারা ; ২৬: ১৯২-১৯৪)।

সুরা শুয়ারার আয়াতটিতে বলা হয়েছে কুরআন নাজিল হয়েছে হযরত (দ:) এর অন্তরে। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমত। কুরআনে আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন : "কিন্তু (আমি এ ওহী তোমার মনে রেখেছি ও তোমার কাছ থেকে তা যে নিয়ে নেয়া হয় নি) --এটা তোমার প্রভুর দয়া। আল্লাহর অসীম রহমত তোমার উপর রয়েছে। " (সুরা ইসরা / বনী ইসরাইল ; ১৭ : ৮৭)

তুমি এটা আশা করো নি যে তোমার উপর এ কিতাব অবতীর্ণ হবে; এ তো কেবল তোমার প্রভুর অনুগ্রহ..... (কাসাস ;২৮: ৮৬)

বলা হয় যে , প্রথম ওহীর পরে বেশ কিছু সময় পর্যন্ত ওহী আসা বন্ধ ছিল। হাদীসে বলা হয়েছে , এরপর যখন আবার ওহী আসা শুরু হয় তখন সুরা আল মুদাসসিরের প্রথম তিনটি আয়াত অবতীর্ণ হয় ---" হে কাপড়ে ঢাকা রাসুল । ওঠো , সতর্ক করো। তোমার প্রভুর প্রশংসা করো " (সুরা মুদাসসির ; ৭৪ : ১-৩)

কুরআনের এসব আয়াত আসার পর আল্লাহর আদেশ হযরত (দ:) মেনে নিলেন ও মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শুরু করলেন।

এরপর একনাগাড়ে ২৩ বছর ধরে ওহী আসলো হযরত (দ:) এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

ওহী গ্রহণের সময় হযরত (দ:) এর অবস্থা : ওহী যখন আসতো , তখন নবীর (দ:) অনুভূতি কেমন হতো তা হাদীসে বলা হয়েছে।

ওহী গ্রহণের সময় উপস্থিত সাহাবীরা বলেছেন , তারা মৌমাছির গুণগুণ আওয়াজের মতো শব্দ শুনতে পেতেন। কিছু সুত্রে জানা যায় , নবীর (দ:) মুখের চারপাশে মৌমাছির গুঞ্জন ধ্বনির মতো শব্দ হতো।

বেশ কিছু হাদীসে নবীর (দ:) শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বর্ণনা এসেছে। আয়শা (রা:) বলেন - রাসুল (দ:) এর কাছে আল হারিথ ইবনে হিশাম জানতে চান - ওহী কিভাবে আপনার কাছে আসে ?

রাসুল (দ:) বলেন , ফিরিশতা যখন আমার কাছে আসেন , তখন কখনো আমি এমন কণ্ঠস্বর শুনি যা অনেকটা ঘন্টাধ্বনির মতো। এই অবস্থা যখন শেষ হয় , তখন আমি মনে করতে পারি ফিরিশতা কী বলেছিলেন । এই ধরণের ওহী নাজিল আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন বোধ হতো।

কখনো ফিরিশতা মানুষের রুপ ধরে এসে কথা বলতেন। আমি তা বুঝতে ও মনে রাখতে পারতাম (আল বুখারী)।

আয়শা (র:) বলেন– এক শীতের দিনে আমি দেখেছি রাসুল (দ:) ওহী গ্রহণ করছেন আর কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে (বুখারী ও তিরমিজী)।

যায়েদ ইবনে সাবিথ বলেন : আমি ওহী লিখতাম। যখন ওহী আসতো-- রাসুল (দ:) বেশ অবসন্ন হয়ে পড়তেন ; তখন মুক্তার মতো ঘাম বের হতো। ওহী গ্রহণ শেষ হলে তিনি তা তেলাওয়াত করতেন আর আমি লিখতাম (তাবারানী – দ্রষ্টব্য টীকা ১)

আবু হুরায়রা বলেন : যখন আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসতো , তখন রাসুল (দ:) এর অবস্থা জ্ঞান হারানোর মতো হতো (আবু নায়ীম – টীকা ২) ।

রাসুল (দ:) এর অন্তরের অন্ত:স্থলে কুরআনকে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল:

কুরআন নাজিল হয় রাসুল (দ:) এর হৃদয়ের গভীরে – ২৩ বছর ধরে আল্লাহ রাসুল (দ:) এর উপর কুরআন নাজিল করেন। কুরআন রাসুল (দ:) এর অন্তরকে মজবুত করে তোলে -- " কাফিররা বলে , পুরো কুরআন তাঁর কাছে একবারে কেন নাযিল করা হলো না ? আমি এটা এজন্য এভাবে নাজিল করেছি যাতে তোমার অন্তর দৃঢ় হয় ও এজন্যই আমি (আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল) ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তোমার কাছে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করি। (সুরা ফুরকান ; ২৫: ৩২)

ওহী নাজিল হওয়ার পুরোটা সময় জুড়েই আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:) কে সমর্থন জুগিয়েছেন ও মানুষের কাছে সঠিকভাবে তাঁর বাণী পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন।

কিভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে , সে সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:) কে উপদেশ দিয়েছেন --" মুখস্ত করার জন্য তুমি ওহী নাজিলের সময় তাড়াতড়ি জিহ্বা নাড়বে না ; এর সংরক্ষন ও পাঠ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার; তাই যখন এটি তেলাওয়াত করা হয় , তখন তা অনুসরণ করো ; এরপরে এর ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমার "
(সুরা কিয়ামাহ; ৭৫ : ১৬–১৯)

আল্লাহ অতি মর্যাদাবান , প্রকৃত অধীশ্বর , তিনি সত্য। তোমার কাছে ওহী নাজিল শেষ হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করো না ও বলো: হে আমার রব ; আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। (সুরা তা–হা; ২০ : ১১৪)

আল্লাহ রাসুলকে সাহায্য করেছেন কুরআনের আয়াত স্মৃতিতে ধরে রাখতে ---" আমি তোমাকে পাঠ করাবো , তাই তুমি কুরআন ভুলবে না "(সুরা আ'লা; ৮৭ : ৬)

কুরআনের সব আয়াত মনে রাখতে পারাটা রাসুল (দ:) এর প্রতি আল্লাহর একটি মুযেজা দান। দরকার মতো কুরআনের আয়াত মনে করতে পারার জন্য দীনের দাওয়াত দেয়াটা রাসুল (দ:) এর জন্য সহজ হয়েছিল---" সরল পথকে তোমার জন্য সহজ করে দেবো " (সুরা আল আ'লা ; ৮৭: ৮)।

পুরো কুরআন মুখস্ত করতে পারা বা কুরআন স্মৃতিতে ধারণ করে রাখা আল্লাহর তরফ থেকে মুযেজা। এর মাধ্যমে কুরআনকে সংরক্ষন করা ও এই নিশ্চয়তা প্রদান করা যে এটি কখনো বিকৃত হবে না বা মানুষ কুরআন ভুলে যাবে না। এই মুযেজা আজো অব্যাহত আছে। অসংখ্য মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনে হাফিজ।

"আল্লাহর কিতাবের যে বাণী তোমার কাছে আসে তা তেলাওয়াত করো। কেউ আল্লাহর বাণীকে বদলে দিতে পারবে না। কখনোই তুমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে নিরাপদ আশ্রয় - স্থল হিসাবে পাবে না
(আল কাহফ ; ১৮: ২৭)

৪. অলৌকিক কুরআন

কুরআন হলো আল্লাহর কথা যা এসেছে সবার জন্য ও শুধু সেই সময়ের জন্য নয় বরং পরবতী সব যুগেরই জন্য। কুরআনকে কেন মুযেজা বলা হবে তার অনেক কারন রয়েছে। তিনটি প্রধান কারন হলো: অসাধারণ ভাষা শৈলী , বিষয়বস্তু ও আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণ।

কুরআনের অসাধারন ভাষা শৈলী-

কুরআন আররবাসীর কাছে আরবী ভাষায় নাজিল হয়। এ নিয়ে কুরআনে বলা হয় -- "কুরআন যদি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আসতো , তাহলে তারা (কাফিররা) অবশ্যই বলতো , আল্লাহর আয়াত সহজভাবে নাজিল হয় নি কেন ? কী ?? একজন আরবের কাছে অনারবী ভাষায় কুরআন ? " (সুরা ফুসিলাত / হা মীম আস সেজদা ; ৪১: ৪৪)।

কুরআনের ভাষার অসাধারনত্ব বুঝতে হলে সে সময়ের আরববাসীর ভাষা শৈলী সম্পর্কে জানতে হবে। কুরআন নাজিল হওয়ার সময়কালে আরবে কাব্য ও সাহিত্য ছিল অত্যন্ত উঁচু স্তরের। অত্যন্ত প্রতিভাবান সব কবি ছিলো যাদের আরবী ভাষায় ছিল খুবই ভাল দখল।

এসব সুদক্ষ কবিরা মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও আদর্শ হিসাবে বিবেচিত ছিল । সাহিত্য ও অলংকারসমৃদ্ধ কাব্য রচনার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়ার কারণেই সাতজন কবির লেখা মুয়াল্লাকাত কবিতা সোনার হরফে লিখে কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলানো হয়। (টীকা ৩)

এসব কবিতা বিভিন্ন উৎসবে যেমন উক্কাজের মেলায় সবার সামনে আবৃত্তি করে শোনানো হতো।

কাব্য চর্চ্চা এত বহুল প্রচলিত ছিল যে এমন কী যাযাবর বেদুইনরাও কবিতা মুখস্ত ও চমৎকারভাবে আবৃত্তি করতে পারতো। অনেক সময় শহরের কবিদের মতো বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে বেদুইনরা আবৃত্তি করতো। মানুষরা সেই আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হতো। (টীকা ৪)

আরবী ভাষা ও সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ এমনই এক সময়ে কুরআন আরববাসীদের কাছে তাদের ভাষায় নাজিল হয়। রাসুল (দ:) যখন মক্কার কাফিরদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনান , তখন তারা তা শুনে মুগ্ধ হয়। অনেক মানুষ ইসলাম কবুল করে শুধুমাত্র কুরআনের চমৎকার বাণী শুনেই। কুরআন শুনে মুগ্ধ হয়ে যারা মুসলমান হন , তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন উমর ইবনে আল খাত্তাব। ইনি আগে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু। সুরা ত্বা হা' র প্রথম কয়েক লাইন শুনে অভিভূত হয়ে তিনি সত্য ধর্মকে মেনে নেন।

অনেক মানুষ কুরআন শুনে যদিও ইসলাম কবুল করে নি , তারা এর উত্তর দিতেও ব্যর্থ হয়। অবিশ্বাসীরা রাসুল (দ:) কে ঠাট্টা – তামাশা করে ও অভিযোগ আনে যে তিনি নিজেই কুরআন লিখেছেন।

"কাফিররা বলে : কুরআন আর কিছুই না শুধু মিথ্যা কথা যা সে নিজে বানিয়েছে ও অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করে। কাফিররা অবিচার করছে ও মিথ্যা বলছে। তারা বলে :

কুরআন আগেকার লোকদের উপকথা যা মুহাম্মাদ (দঃ) নকল করেছে ও সেটা সকাল – সন্ধ্যা তাঁকে পড়ে শুনানো হয় " (সুরা ফুরকান; ২৫ : ৪–৫)।

এই প্রেক্ষাপটে আল্লাহ অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ভাষার অধিকারী আরবের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক আবৃত্তিকার ও অন্যান্যদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন । সুরা বাকারায় আল্লাহ বলেন – "আমার দাসের কাছে যা নাজিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে এরকম সমমানের আরেকটি সুরা রচনা করো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য সাক্ষীদের ডেকে নাও যদি তোমরা সত্য বলে থাকো" (বাকারা; ২:২৩)।

রাসুল (দঃ) কুরআন লিখেছেন এই অভিযোগের জ্ঞানগর্ভ উত্তর এর থেকে আর কী হতে পারতো ?––" তারা কি বলে রাসুল নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো: তাহলে কুরআনের সুরার মতো একটি সুরা বানিয়ে আনো আর এ কাজে আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডাকো যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। " (সুরা ইউনুস; ১০: ৩৮)

আল্লাহ জানতেন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না।

"বলো : যদি মানুষ ও জিন সব একসাথে হয়ে কুরআনের মত কিছু লিখতে চায় , তাহলে তারা তা কখনোই পারবে না যদিও তারা একে অন্যকে সাহায্য করে " (সুরা ইসরা; ১৭ : ৮৮)।

" আর তারা কি বলে – সে নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো : তাহলে কুরআনের সুরার সমমানের দশটি সুরা লিখো ও আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডাকো এ কাজে যদি তোমরা সত্যই বলে থাকো। যদি তারা উত্তর না দেয় , তবে জেনে রাখো কুরআন আল্লাহরই জ্ঞান থেকে এসেছে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোন প্রভু নেই। তবুও কি তোমরা আত্মসমর্পনকারী (মুসলিম) হবে না ?" (সুরা হুদ ; ১১ : ১৩–১৪)।

" তারা কি বলে , সে { মুহাম্মাদ (দঃ)} নিজেই এটা বানিয়েছে ? বলো : তাহলে কুরআনের সুরার মতো একটি সুরা নিয়ে আসো আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাকো এ কাছে যদি তোমরা সত্য বলে থাকো। না , আসলে তারা তাই অস্বীকার করছে যা তাদের জ্ঞানে তারা বুঝতে পারছে না ও যার অর্থ তাদের কাছে এখনো আসে নি। এইভাবে আগের মানুষেরাও সত্যকে অস্বীকার করেছিল। দেখে নাও সত্য প্রত্যাখানকারীদের পরিণতি। (সুরা ইউনুস; ১০ : ৩৮–৩৯) ।

বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ বদিউজ্জামান সৈয়দ নুরসী আরবদের উপর কুরআনের প্রভাব সম্পর্কে বলেন:

কুরআন যখন আসলো তখন তা একই সাথে বিশেষজ্ঞদের সামনে চারটি ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছিল।
প্রথমত: মানুষকে সেজদায় অবনত হতে বললো , তারা আশ্চর্য হয়ে তা শুনলো।

দ্বিতীয়ত: কুরআন আরবের বিখ্যাত কবি ও আবৃত্তিকারদের হতভম্ব করে দেয়।
স্তম্ভিত এই সব কবির দল নিজেদের ব্যর্থতায় হতাশায় আঙুল কামড়াতে থাকে (আরবীতে হতাশা , ক্ষোভ , বিরক্তি বোঝাতে ' ক্রোধে আঙুল কামড়ানো ' বলা হয়)। তাদের বিখ্যাত সাতটি কবিতা যা সে সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে বিবেচিত হতো ও সোনার হরফে কাবার দেয়ালে ঝুলে তাদের অহংকার বাড়াতো , সেই সম্মান ধুলিস্মাৎ হয়ে যায় ।

৩/ যারা জাদু – টোনা ও ভবিষ্যত বাণী করতো তারা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় । অদৃশ্যের জ্ঞান সম্পর্কে জানার চেষ্টা বন্ধ হয়। দুষ্টু জিন্নরা বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয় ও ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টার ইতি ঘটে।

৪/ কুরআন নানা ভুল তথ্য ,জালিয়াতি , উপকথা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। জ্যোতির্বিদ্যা , অতীতের ঘটনা , সৃষ্টি রহস্য ইত্যাদি সম্পর্কে কুরআন মানুষকে সঠিক তথ্য দেয়।

এভাবে এই চারটি দল চমৎকৃত হয়ে কুরআনের সামনে মাথা নত করে ও শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে কুরআনের ছাত্র হয়। এদের কেউ কুরআনের একটি আয়াতের সাথেও দ্বিমত পোষন করতে সাহয় পায় নি (টীকা ৫)

কুরআন এমন একটি বই যার সমতুল্য কোন বই লিখতে আজো কোন মানুষ পারে নি। কুরআনের আরবী অত্যন্ত বিশুদ্ধ একটি ভাষা। আরবরা এখন যেভাবে কথা বলে , সেরকমটি নয়।

কুরআনের বার্তা স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এরপরেও অলংকারসমৃদ্ধ । অনেক রুপক ও উপমা ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনের বার্তাকে সহজ করার জন্য :

"আমি পুরো কুরআনে অনেক উদাহরণ দিয়েছি মানুষের জন্য কিন্তু অন্য কিছু থেকে মানুষ তর্ক করতে বেশী পছন্দ করে " (সুরা কাহফ; ১৮ : ৫৪)।

কুরআন হলো অত্যন্ত উঁচু স্তরের ও গভীর অর্থবোধক বই । কুরআনের উপর হালকা নজর দিলেই বোঝা যায় সীমিত সংখ্যা (দুই হাজারের মতো) শব্দ দিয়ে অসংখ্য আদেশ , মতবাদ ও জ্ঞান মানুষকে দান করা হয়েছে।

কুরআনে অনেক কিছু বারবার বলা হয়েছে যার ফলে পাঠকের জন্য বুঝতে পারা ও মনে রাখা সহজ হয়।

“ আমি কুরআনকে বুঝতে পারা ও মনে রাখার জন্য অবশ্যই সহজ করে দিয়েছি ...” (সুরা কামার ; ৫৪: ১৭)।

যদিও কিছু কথা বারবার এসেছে , এরপরেও কুরআন পড়ার সময় মনে হয় না এটা পুনরাবৃত্তি। জীবনভর কুরআন বারবার পড়ে গেলেও তাই কেউ ক্লান্ত হয় না বা কুরআনের মাধুর্য্য অনুভব করতে অসুবিধা হয় না।

“আল্লাহ পাঠিয়েছেন ধর্ম বিষয়ে সেরা উপদেশ , একটি কিতাব যাতে পুনরাবৃত্তি রয়েছে সুসংহতভাবে ”
(সুরা যুমার ; ৩৯: ২৩)

কুরআনের বিষয়বস্তু :

কুরআন হলো ঐশী বাণী । মানবজাতির জন্য এতে রয়েছে আল্লাহর তরফ থেকে হেদায়েত। নিজেকে চিনতে এটি মানুষকে সাহায্য করে , কুরআন মানুষকে অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে এমন সব তথ্য দেয় , যা কোন মানুষ বা জ্বীন –ফিরিশতার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কুরআন যা বলে তা সত্য।

এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য যা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা গিয়েছে , তা চৌদ্দশত বছর আগেই কুরআনে বলা হয়েছে। জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু , অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সত্য প্রকাশ , অজ্ঞতা দুর ও মানব চরিত্র সম্পর্কে গুঢ় রহস্য প্রকাশ --এ সব দিক থেকেই কুরআন অতুলনীয়। কুরআনের ঐশ্বরিক চরিত্র ওহী নাজিলের শুরুর সময় থেকে ভবিষ্যতের সব মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কুরআনের আদেশ–নিষেধ কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। আগে যেমন ছিল , তেমনি বর্তমান ও ভবিষ্যতেও মানুষের জন্য কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য ।

“ ... কুরআনে জাহান্নামের এই বর্ণনা আর কিছুই নয় বরং পুরো মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর সতর্ক বাণী ” (সুরা মুদ্দাসিসির; ৭৪ :৩১)

“...আর এই (কুরআন) তো আর কিছু নয় বরং পুরো বিশ্বজগতের জন্য সতর্কবাণী ” (সুরা কালাম ; ৬৮: ৫২)।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাঁর মর্যাদা , শক্তি , সৃষ্টির প্রতি করুণার কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান যে এই মহাবিশ্বের তিনিই স্রষ্টা , জাগতিক সব চাহিদা থেকে তিনি মুক্ত। আল্লাহ সম্পুর্ণ ত্রুটিমুক্ত , তিনি সব জানেন , সব দেখেন।

আমরা যে স্রষ্টার উপাসনা করি , তার সম্পর্কে খুব ভালভাবে জানাটা জরুরী --যেন আমরা স্রষ্টার করুণার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারি ও বেশী বেশী করে তাঁকে সন্তুষ্ট করার সংগ্রাম করতে পারি।

কুরআনে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেছেন সরাসরি । ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেছেন , সমাজের জন্য বলেছেন , মুসলমান – অমুসলমান নির্বিশেষে সবাইকে তিনি তাঁর বাণী দিয়েছেন , সমর্থন ও নিরাপত্তা দিয়েছেন , সুখবর দিয়েছেন , দিয়েছেন সতর্ক বাণী ।

আল্লাহ জানান তিনি আমাদের বন্ধু ,সাহায্যকারী , বিপদের সময় মানুষ যেন তাঁরই সাহায্য চায়। যেহেতু আল্লাহ সব কিছুরই স্রষ্টা , তিনি জানেন তাঁর সৃষ্টির জন্য কোনটা ভাল --ব্যক্তি ও সমগ্র মানবজাতির জন্যই এটা প্রযোজ্য। সেজন্য তিনি কুরআনে মানুষের জন্য প্রযোজ্য তাঁর আইনের কথা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশিত সীমারেখায় আমাদের থাকতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কী ভাল , কী খারাপ , কোনটা বৈধ , কোনটা অবৈধ-- “তিনিই তোমার প্রতি কুরআন নাজিল করেছেন ; এতে সুস্পষ্ট কিছু আয়াত রয়েছে --সেটাই হলো কিতাবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ ...”(সুরা ইমরান ; ৩: ৭) ।

কুরআনে যে পথ দেখানো হয়েছে , তা জ্ঞানে ভরা ও সহজেই বোঝা যায়। কুরআনের আয়াতে যে আদেশ ও নিষেধ আছে তা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য। আল্লাহ যাকে সত্য পথে পরিচালিত করেছেন , সেই বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কোন অসুবিধা ছাড়াই কুরআনের নির্দেশ বোঝা ও মেনে চলা সহজ ।

কুরআন শুধু আইনের কোন বই নয় বরং তার থেকেও অনেক বেশী কিছু। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন কিভাবে দেহ ও আত্মার জন্য কল্যাণকর এটি। অপ্রত্যাশিত বিপদ বা যে কোন কঠিন সময়ে কী করতে হবে , আল্লাহ কুরআনে তা জানিয়ে দিয়েছেন। মানব চরিত্রের নানা দিকও

কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তির রোজকার ও সমাজ জীবনের নানা সমস্যা দুর করার জ্ঞান আল্লাহ কুরআনে দান করেছেন। অন্য কথায় , ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে কাটাতে হবে , সমস্যা তা যতই জটিল হোক্ না কেন কিভাবে তার মোকাবেলা করতে হবে , সেই জ্ঞান দেয়া আছে কুরআনে।

কুরআন থেকে তারাই সান্ত্বনা আর উপদেশ নিতে পারে যারা আল্লাহকে ভয় পায় ; তাঁর দেয়া আদেশ-নিষেধ মেনে চলে , যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পনকারী ও এই দুনিয়া থেকে পরকালের জীবনকে বেশী প্রাধান্য দেয়।

আল্লাহ বলেন , ‘ তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না , না কি তাদের মন তালাবন্ধ ?”
(সুরা মুহাম্মাদ ; ৪৭: ২৪)

আল্লাহর আদেশ মেনে চলতে সাহায্য করতে কুরআনে অতীতের অনেক মানুষ ও জাতির কাহিনী বলা হয়েছে --- তারা ছিল আল্লাহকে অস্বীকারকারী বা অবাধ্যতাকারী।
আমরা জানতে পারি সেই সব অবাধ্যতাকারীদের ভাগ্যে কী ঘটেছিল ও কিভাবে তারা শাস্তি পেয়েছিল। কুরআনে এসব কাহিনী বলা হয়েছে যেন অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি।এটা আল্লাহর রহমত আমাদের প্রতি --“ কুরআনে বেশ কিছু নগরীর কথা তোমার কাছে বলেছি ; এসব শহরের কিছু এখনো দাড়িয়ে আছে , আর বাকীগুলি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে ”(সুরা হুদ; ১১:১০০)

অতীতের কাহিনীগুলি অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ দেয় যে কুরআন স্রষ্টার বাণী। কেননা, রাসুল (দ:) এর পক্ষে কোনভাবেই অতীতের কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ জানা সম্ভব ছিল না ; কেননা তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না ; কোন শিক্ষক বা কোন চিন্তাবিদ তাকে লেখাপড়া বা অন্য কিছু শেখান নি । তিনি খুব বেশী দেশও ঘুরে বেড়ান নি। এসবই প্রমাণ যে তাঁর পক্ষে কোনভাবেই কুরআন লেখা সম্ভব ছিল না।

সাম্প্রতিককালে ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদরা কুরআনে বর্ণিত অতীতের অনেক ঘটনার প্রমাণ পেয়েছেন---- (টীকা ৬)

“এসব কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য আছে শিক্ষা। এসব বানানো কাহিনী নয় ; কুরআন আগেকার কিতাবগুলির সমর্থক ও সব কিছুর ব্যাখ্যা আছে এতে ও মু’মিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত ”(সুরা ইউসুফ; ১২ : ১১১)

কুরআনের আদেশ–নিষেধ দেয়া হয়েছে যাতে আমরা পরকালে সফল হতে পারি। ঈমান ও আমল অনুযায়ী আমরা পরকালে কিভাবে পুরস্কৃত হবো , তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ভাল কাজে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুরআনে বেহেশতের বাগানের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে যাতে এটা পেতে আমরা সংগ্রাম করি ও আল্লাহর ইচ্ছায় তা পেয়ে যাই। একইভাবে দোযখের ছবিও বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যাতে আমরা কখনো অবিশ্বাসী না হয়ে পড়ি ; প্রকাশ্যে বা ভুল করেও অন্য কাউকে আল্লাহর শরীক না করি ; খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করি।

“ কুরআন তোমাকে ও তোমার জাতিকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর সতর্ক বার্তা ; কুরআনের ব্যপারে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে ”(সুরা যুখরুফ; ৪৩ : ৪৪)

আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি আমাদেরকে ভাল– মন্দ বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছেন । এই জ্ঞান–বুদ্ধি , বিচার – বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যেন স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করি ––“ আর আল্লাহর নিদর্শনসমুহের মধ্যে আছে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানুষের মধ্যে ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য ; যারা জ্ঞানী তাদের জন্য এসবের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ” (সুরা রুম; ৩০: ২২)

কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে বৈজ্ঞানিক সুত্রের উল্লেখ আছে। গবেষকরা এসব তথ্যাদি সাম্প্রতিক সময়ে জানতে পেরেছে উন্নত প্রযুক্তি , কখনো বা জটিল গাণিতিক হিসাব নিকাশের সাহায্যে। যে সময় কুরআন নাজিল হলো সে সময় এসব বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আবিষ্কার করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মানবজাতির জন্য স্রষ্টার তরফ থেকে কুরআন এসেছে –– এটা যারা বিশ্বাস করে না , তাদের জন্য এটি একটি গভীর চিন্তার বিষয়।

৭ম শতাব্দীতে যখন কুরআন নাজিল হয় , তখন এই বিশ্বজগত সম্পর্কে আরবদের মধ্যে নানা ধরণের মিথ্যা তত্ত্ব ও উপকথা প্রচলিত ছিল। সে সময় আরবদের কাছে এমন কোন জ্ঞান প্রযুক্তি ছিল না , যাতে তারা পৃথিবী বা মহাজগত বা প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে। তারা যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রচলিত গল্প–কাহিনীতে বিশ্বাস রাখতো যেমন উঁচু উঁচু পাহাড়–পর্বত আকাশকে ধরে রাখে; পৃথিবী হলো সমতল ও এর দুই প্রান্তে উঁচু পাহাড় স্তম্ভের মতো দাড়িয়ে আকাশকে ধরে রাখে । এসব প্রচলিত কল্প – কাহিনী ও কু–সংস্কার দুর হলো ওহী

নাজিলের মধ্য দিয়ে --" তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশকে উপরে সৃষ্টি করেছেন কোন স্তম্ভ ছাড়া " (সুরা রাদ; ১৩: ২)।

বেশীরভাগ মানুষই কিছুই জানতো না এমন অনেক বিষয়ে ওহী নাজিল হয়। কুরআন যে সময় এই দুনিয়ায় আসে , মানুষ জ্যোতির্বিদ্যা , পদার্থবিদ্যা , জীববিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে খুবই কম জানতো । কুরআন মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টি , প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপুর্ণ তথ্য দেয়। এমন কী কুরআনে এমন সব তথ্য আছে যা সম্পুর্ণ বুঝে উঠতে পারা এখনো সম্ভব হয় নি ; কেননা সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট জ্ঞান মানুষের এখন নেই।

এই দুনিয়ার ও পরবতী জীবন সম্পর্কে কুরআনে অনেক ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে-- এটা কুরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য । যদিও কুরআনে এমন কিছু তথ্য আছে যা কেবল জ্ঞানীরাই বুঝবে , একইসাথে এতে সাধারণ মানুষের বোঝার মতো সহজ – সরল কথাও আছে।

কুরআন বুঝতে হলে দরকার আন্তরিকতা । কুরআন পুরো মানবজাতির তবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস করে , তারাই কেবল কুরআন থেকে সৎ পথের নির্দেশ পাবে।

" এগুলি জ্ঞানগর্ভ কুরআনের আয়াত-- যা হিদায়েত ও রহমত ভাল মানুষদের জন্য " (সুরা লুকমান ; ৩১: ২-৩)

" হে মানুষ ; তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে সতর্কবাণী এসেছে ও বিশ্বাসীদের জন্য অন্তরের প্রশান্তি , হেদায়েত ও ক্ষমা "(ইউনুস; ১০ : ৫৭)

বদিউজ্জামান সৈয়দ নুরসী বলেন , আল্লাহর অনুগত দাসদের জন্য কুরআন হলো সত্যের পথ-প্রদর্শক । সব জ্ঞানের ভান্ডার কুরআন মানুষের সচেতনতা ও বিবেচনাবোধের নেতৃত্ব দানকারী , নর-নারী ও জ্বীনের পথ প্রদর্শক ও দোষ -ত্রুটি থেকে মুক্তি চায় যারা তাদের শিক্ষক ও সত্যকে খুঁজে পেতে চায় যারা তাদের প্রশিক্ষক (টীকা ৭)

কুরআন জানায় , আল্লাহর বাণী পরিপুর্ণভাবে আমাদের কাছে এসেছে ও একজন মানুষ তখনই সত্যকে পাবে যখন সে কুরআন ও রাসুলের আদর্শকে অনুসরণ করবে--" ...আমি কুরআনে কোন কিছু উপেক্ষা করি নি "...(সুরা আনাম; ৬: ৩৮)।

"....আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে , কুরআন তোমার রবের কাছ থেকে সত্যসহ এসেছে। তাই কোন অবস্থাতেই তুমি সন্দেহবাদীদের একজন হবে না। সত্য ও

ন্যায়ের দিক থেকে তোমার রবের বাণী একদম নিখুঁত। তাঁর বাণী বদলে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি সব শুনেন , সব জানেন " (সুরা আনাম; ৬: ১১৪–১১৫)।

কুরআনের সংরক্ষণ--

কুরআনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর কাছে এটা যেভাবে এসেছিল , আমরা ঠিক সেই অবিকৃত কুরআনই আজো আমাদের মাঝে পাই।

" আমিই কুরআন পাঠিয়েছি ও আমিই একে হেফাযত করবো " (সুরা হিজর ; ১৫: ৯)

"...আল্লাহর বাণী কেউ বদলে দিতে পারবে না " (সুরা কাহফ ; ১৮: ২৭)

কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে আসা প্রথম আসমানী কিতাব নয়। কুরআন বলছে --
" আল্লাহ সত্যসহ কিতাব পাঠিয়েছেন তোমার কাছে যা আগের কিতাবগুলির সত্যায়ন করে। আর তিনিই পাঠিয়েছিলেন তাওরাত ও ইনজীল মানুষের হেদায়েতের জন্য...." (সুরা ইমরান; ৩: ৩–৪)

কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য হলো যে এটা আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব ও আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও আগে যেভাবে কুরআন পড়া হতো ঠিক সেভাবেই আজো পড়া হয়। সব যুগেই কুরআন অবিকৃত থাকবে।

আগের আসমানী কিতাবগুলি যেভাবে রাসুলদের (দ:) কাছে এসেছিল , আজ আর সেভাবে নেই--পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। সময়ের সাথে সাথে মানুষ সেগুলির পরিবর্তন , সংযোজন করেছে। কখনো বা পুরো অধ্যায়ই বাদ দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর কাছে যখনই ওহী নাজিল হতো , আল্লাহ অলৌকিকভাবে তা রাসুল (দ:) এর মনে স্থায়ী করে দিতেন অর্থাৎ রাসুল (দ:) তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারতেন। মুখস্ত করার পাশাপাশি রাসুল (দ:) সাহাবীদেরকে দিয়ে আয়াতগুলি লিখিয়েও রাখতেন। সাহাবীদের মধ্যে যারা আয়াত লিখে সংরক্ষণ করতেন , তাদেরকে বলা হয় ওহী লেখক ।

এভাবে কুরআন লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়। খলিফা আবু বকর (রা:) এর সময় কুরআনের একটি কপি বাঁধাই করা হয়। খলিফা ওসমান (রা:) এর সময় কুরআনের একাধিক কপি তৈরী করে ইসলামের প্রধান প্রধান নগরীতে পাঠানো হয়। ঐশ্বরিক উপায়ে কুরআনকে অবিকৃত

রাখা হয়েছে এবং আল্লাহর ইচ্ছাতেই কুরআন তাই এত শক্তিশালী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী কিতাব ।

“...নিশ্চয়ই এটি অতি সম্মানিত কিতাব । কোন মিথ্যা এতে আসতে পারে না --সামনের থেকেও না , পিছনের থেকেও না। এই কুরআন তাঁর কাছ থেকে এসেছে যিনি অতি জ্ঞানময় , সব প্রশংসার মালিক ”
(সুরা ফুসিলাত ; ৪১: ৪১-৪২)

“ যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম , তাহলে তুমি দেখতে পেতে আল্লাহর ভয়ে পাহাড় নত ও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে । আমি এসব উদাহরণ দেই যাতে মানুষ ভেবে দেখে ”
(সুরা হাশর; ৫৯ : ২১)

কুরআন তেলাওয়াতে লাভ অনেক । কুরআনকে বুঝতে পারলে শুধু এই দুনিয়ায় নয় বরং পরকালেও অনেক লাভ আছে ।

“ .. তোমাদের কাছে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে নুর ও স্পষ্ট কিতাব। যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায় , আল্লাহ এ কুরআন দিয়ে তাঁদেরকে শান্তির পথে নিয়ে যাবেন । আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় অন্ধকার থেকে তাঁদেরকে আলোতে আনবেন ও সরল পথে নিয়ে যাবেন (সুরা ৫: ১৫-১৬)

“মানুষের জন্য এটা অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্বাসীদের জন্য হেদায়েত ও রহমত ” (সুরা জাসিয়া ; ৪৫: ২০)।

রাসুল (দ:) বলেন : কেয়ামতের দিনে কুরআন হবে সুপারিশকারী। যে কুরআনকে সঙ্গী করেছে , কুরআন তাকে বেহেশতে নিয়ে যাবে ; যে কুরআনকে পিছনে ফেলে রাখতো , কুরআন তাকে দোযখে নিয়ে যাবে
(আল তাবারানী ; বর্ণনাকারী : আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ)।

কুরআন তেলাওয়াত মনকে শান্ত রাখে , হৃদয়ে শান্তি দেয়। এটা আত্মার খোরাক । বিশ্বাসীদের জন্য কুরআন আল্লাহর তরফ থেকে পথ – প্রদর্শক ও ক্ষমা : “ কেবল মাত্র আল্লাহর স্মরণেই (যিকির , ইবাদতে) মনে শান্তি আসবে (সুরা রাদ; ১৩: ২৮)

“ যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন শান্তভাবে তা শুনো যাতে আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারো ”
(সুরা আরাফ ;৭: ২০৪)

৫/ রাসুল (দ:) অসাধারণ মহৎ চরিত্র--এটাও এক মুযেজা

আল্লাহর কাছে রাসুল (দ:) একজন সম্মানিত মানুষ ও আল্লাহর বিশেষ রহমত রয়েছে তাঁর উপর। আল্লাহ রাসুল (দ:) কে তাঁর এক অনুগত দাস হিসাবে সৃষ্টি করেছেন ও দুনিয়াতে তাঁকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন।

রাসুল (দ:) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আস্থাভাজন । সততার দিক থেকে তিনি ছিলেন সবার আদর্শ। তিনি আল্লাহর একজন মহান রাসুল (দ:) যার তাকওয়া , উন্নত স্বভাব -চরিত্র ছিল অনুকরণীয়। তাঁর সহানুভূতি , ভদ্রতা , অসাধারণ সহমর্মিতা , স্রষ্টাতে বিশ্বাস , ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্প ইত্যাদির জন্য তিনি হলেন সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক নেতা ও আমাদের সবারই আদর্শ।

রাসুল (দ:) সম্পর্কে হযরত আলী (র:) এর নাতি ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ বলেন :
যখনই রাসুল (দ:) এর মহৎ চরিত্র নিয়ে আলী (র:) কিছু বলতেন , তিনি সাধারণত এভাবেই বলতেন , “ তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র , সবচেয়ে বিশ্বাসী , সবচেয়ে দয়ালু হৃদয়ের । তাঁকে দেখার পর সবার মনেই শ্রদ্ধা জাগতো। যে কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতো ও অপুর্ব স্বভাব -চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারতো , সেই রাসুল (দ:) কে ভালবেসে ফেলতো। আমি তাঁর মতো কাউকে আগেও দেখি নি , পরেও না। ” (আল তিরমিযী)

রাসুল (দ:) নিজ জাতির কাছে পরিচিত ছিলেন আল আমিন বা বিশ্বাসী বলে। সবাই একমত ছিল যে রাসুল (দ:) হলেন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। রাসুল (দ:) এর চেহারায় এক পবিত্র নুর চমক দিতো যা দেখে মানুষ প্রভাবিত হতো ও তাঁর সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হতো। যারা তাঁর কথা শুনতো বা তাঁর সাথে আলাপ করতো , তারা বুঝতে পারতো ইনি একজন বিশেষ কেউ। তারা অনেক প্রমাণ পেতো যে ইনি একজন নবী। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান , অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন।

রাসুল (দ:) এর চরিত্রের মহত্বের জন্য এমন কী অমুসলিমরাও তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর কাছে যেত।

রাসুল (দ:) এর মহত্ব ও পবিত্রতা সাহাবীরা সবসময়ই প্রত্যক্ষ করতেন। এই বিষয়ে ইবনে আসকাবের কাছ থেকে শুনে ইবনে সাদ এভাবে বর্ণনা করেন - আল্লাহর রাসুল (দ:) সততার দিক

থেকে সবার মধ্যে সেরা ছিলেন । স্বভাবে ছিলেন সবচেয়ে মধুর। সামাজিক সম্পর্কে প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সবচেয়ে নিখুঁত , পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র , সৌজন্যতা ও নিরাপত্তা প্রদানে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী , ছিলেন সত্যবাদী ও ভাল , ভদ্র ব্যবহারের প্রতি যিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন। রাসুল (দঃ) এসব ভাল গুণেরই অধিকারী ছিলেন--এসব কারণে সবাই তাঁকে আল আমীন ডাকতো--সত্যবাদী ও বিশ্বাসী (টীকা ৮)

ইবনে হিশাম বলেন : অজ্ঞতার যুগ থেকে শুরু করে ইসলাম আসা পর্যন্ত সবাই যে যার মতবিরোধ মেটাতে রাসুল (দঃ) এর কাছে আসতো (টীকা ৯) (বর্ণনাকারী ইবনে সাদ)।

ইবনে সিহাব জানান : কুরাইশরা যখন কাবা ঘর মেরামতসহ নতুন করে বানানো শুরু করে , হজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর কিভাবে বা কারা কাবা ঘরে বসাবে তা নিয়ে সবাই বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। আরবের সব গোষ্ঠির লোকেরাই চাচ্ছিলো তারাই এই পাথর কাবা ঘরে স্থাপন করবে। তারা বললো " , যে এই পথ দিয়ে প্রথম আসবে , তাকেই আমরা বিচারক বানাবো আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য। " রাসুল (দঃ) প্রথম ঐ রাস্তা দিয়ে প্রথম আসলেন। নির্ভরযোগ্য সুত্রে বলা হয় , তাঁর বয়স তখন ছিল ৩৫ ।

সবাই তাঁকে বিচারক হিসাবে মেনে নিলো। রাসুল (দঃ) বললেন , একটা চাদর এনে মাটিতে বিছাও। তারপর তিনি বললেন , " একসাথে ধরে পাথরটি চাদরের উপর রাখো। এরপর বললেন , নিজ নিজ দলের প্রবীণতম ব্যক্তি এসে চাদরের কোণা ধরুক। সব দলের প্রতিনিধিত্বকারীরা চাদর ধরে পাথর কাবার কাছে নিয়ে গেল। এরপর রাসুল (দঃ) নিজ হাতে তাদের কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে কাবা ঘরে বসিয়ে দিলেন।

নবী (দঃ) বড় হওয়ার সাথে সাথে সবার থেকেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন । সততার কারণে তিনি যে সুনাম অর্জন করেছিলেন , সে কারণে তিনি পরিচিত ছিলেন আল-আমীন বা সবচেয়ে বিশ্বাসী হিসাবে। এসব ওহী নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা (টীকা ১০)

যদিও কুরআন নাজিল হওয়ার পর রাসুল (দঃ) এর প্রতি অবিশ্বাসীদের মনোভাব পাল্টে যায়। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায় ইসলামের প্রসার বন্ধ করার জন্য যদিও তারা সবসময় দেখে এসেছে নবী (দঃ) স্বভাব-চরিত্রে কতটা ভাল , তবুও তারা নবীর (দঃ) ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ কুরআন বলেন : " এরা অবাক হয় যে তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছেন। কাফিররা বলে : এ এক মিথ্যাবাদী যাদুকর। "(সুরা সাদঃ ৪)

যারা আল্লাহর নির্বাচিত ও রহমতপ্রাপ্ত ভাল মানুষের নামে অপবাদ দেয় , তারা কিন্তু তার মহত্ত্বের সাক্ষী ছিল । নিজ চোখেই তারা দেখেছিল নবী (দঃ) কিভাবে কথা দিয়ে কথা রাখেন।

তাঁর বিশ্বস্বতা , ন্যায়-বিচার ,সততা , সত্যবাদিতা , বিধবা , এতিম ও দু:খীর প্রতি দয়া এবং সবার সাথেই তাঁর ভদ্র ব্যবহার -- এ সবই ছিল তাদের জানা। নবীর (দ:) অসাধারণ মহৎ স্বভাব সবসময়ই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতো। তিনি ছিলেন মানুষের বিশ্বাসভাজন বন্ধু , ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র।

ইসলামিক সুত্র মতে নবীর (দ:) নামে অপবাদ দেয় লাদর ইবনে আল হারিথ । একদিন ঐ ব্যক্তি কুরাইশ নেতাদের সাথে দেখা করে ও বলে : হে কুরাইশগণ , আমি শপথ করে বলছি আজ তোমরা যার মোকাবেলা করছো , সে রকম কিছু আগে তোমাদের কখনো করতে হয় নি। ছোটবেলা থেকেই মুহাম্মাদ (দ:) ছিল তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ , সবচেয়ে সত্যবাদী ও সবচেয়ে শ্রদ্ধার। যখন সে বড় হয়ে আল্লাহর বাণী নিয়ে এলো , তখন তোমরা বললে সে জাদুকর। আমি শপথ করে বলছি সে জাদুকর নয়-- আমরা অনেক জাদুকর ও তারা কিভাবে ঝাড়-ফুঁক করে সেসব দেখেছি ।

এরপর তোমরা বললে সে গণক। আমি শপথ করছি সে গণক নয়। আমরা কত গণক দেখেছি , তাদের কথা শুনেছি , তোমরা বললে সে কবি --আমি শপথ করছি সে কবি নয়। কত কবিতাই না আমরা শুনেছি , শিখেছি , কবিতার ছন্দ বুঝেছি । তোমরা বললে সে পাগল --শপথ করছি সে পাগল নয়। তাঁর মধ্যে কোন পাগলামি নেই , পাগলের মতো মুর্ছা যাওয়া বা অর্থহীন প্রলাপ --কিছুই তার মধ্যে নেই। কুরাইশরা , ভালভাবে চিন্তা করো ও সিদ্ধান্ত নাও। (টীকা ১১)

রাসুল (দ:) এর অপুর্ব চরিত্র সম্পর্কে বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম আল গাজ্জালী বর্ণনা করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলক আত তিরমিযী , আত তাবারানী , ইমাম আল বুখারী , ইমাম মুসলিম , ইমাম আহমেদ , আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ থেকে। রাসুল (দ:) ছিলেন সবচেয়ে ধৈর্যশীল ও সাহসী মানুষ ; সবচেয়ে ন্যায়পরায়ন , তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ক্ষমা প্রদর্শনকারী মানুষ। সবচেয়ে দয়াশীল । আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে রাসুল (দ:) এর জন্য যে জীবিকা ও খাদ্য সম্ভারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন , রাসুল (দ:) কখনোই তার থেকে এক বছরের বেশী কিছু জমা রাখতেন না । বেশী খাবার থাকলে তা গরীবদের মাঝে দান করতেন । কেউ কিছু চাইলে তা তিনি দিয়ে দিতেন। এমন কী তাঁর কাছে যা আছে তার বেশীও তিনি দান করতেন। তিনি সবসময় সত্য বলতেন যদিও তা কখনো কখনো তাঁর নিজের ও সাহাবীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতো।

তিনি বিয়ের দাওয়াত কবুল করতেন , অসুস্থ মানুষকে দেখতে যেতেন জানাযায় অংশ নিতেন । তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী , অহংকারমুক্ত ; বক্তব্য দীর্ঘ না করেই তিনি চমৎকারভাবে কথা বলতেন । তাঁর সংবিধান ছিল সুন্দরতম।

তিনি অসুস্থ মানুষকে দেখতে অনেক দুরেও চলে যেতেন-- গরীব , দু:স্থদের পাশে বসতেন , তাদের সাথে খেতেন , যারা ভাল মানুষ তাদেরকে সম্মান করতেন , আরো ভাল কাজ করতে উপদেশ দিতেন , আত্মীয়দের প্রতি দয়া দেখাতে বলতেন । তিনি কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করতেন না । কেউ কোন ওজর পেশ করলে তা মেনে নিতেন।

তিনি কৌতুক করার সময়েও সত্য বলতেন। নির্দোষ খেলায় তিনি অংশ নিতেন। স্ত্রীর সাথে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন। কোন গরীবকে তার অভাবের জন্য নবী (দ:)তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন না। কোন ধনীকে তার সম্পদের জন্য আলাদা খাতির দেখাতেন না। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকতেন। (টীকা ১২)

রাসুল (দ:) এর মহৎ চরিত্র , প্রতিকূলতার মুখে তাঁর অসাধারণ দৃঢ়তা , তাঁর উদার - ভদ্র স্বভাবের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন । রাসুল (দ:) এর গুণাবলীর কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে

" তোমার জন্য পুরষ্কার রয়েছে যা কখনো শেষ হবে না ; অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের (সুরা কালাম; ৬৮:৩-৪)

" ... নিশ্চয়ই কুরআন এক সম্মানিত বার্তাবাহক { জিবরাইল (আ:)} নিয়ে এসেছেন " (সুরা হাক্কা; ৬৯:৪০)

আল্লাহর সাহায্য ও আসমানী কিতাব নাজিল এবং রাসুল (দ:) এর চরিত্রের দৃঢ়তায় একটি জাতি মাত্র ২৩ বছরে অন্ধকার থেকে আলোতে আসে। যে মানুষেরা তাদের নারীদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করতো , সন্তানের সাথে এতটাই নির্মম ছিল যে শিশু কন্যাকে জীবন্ত কবর দিতো , যারা গরীব আর দাসদের প্রতি ছিল নিষ্ঠুর --তারাই ইসলামের আলো পেয়ে হলো সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ।

যে মানুষেরা নানা রকম পাথর আর মূর্তির পুজা করতো , নানা কু-সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল , তারা এখন এক মহান স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এই চরম ও স্থায়ী পরিবর্তনের জন্য রাসুল (দ:) কে অনেক

কষ্ট করতে হয়েছে। মুশরিকরা রাসুল (দঃ) কে প্রস্তাব দিয়েছিল যদি তিনি আল্লাহর কথা বলা বন্ধ করেন , তবে তাঁকে অনেক ধন-সম্পদ ও অন্যান্য কিছু উপহার দেয়া হবে । কিন্তু রাসুল (দঃ) এসব প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন।

[অনুবাদকের সংযোজন : রাসুল (দঃ) তাঁর চাচাকে বলেন : " আল্লাহর শপথ । যদি কাফিররা আমার ডান হাতে সুর্য আর বাম হাতে চাঁদকেও এনে দেয় , আমি ইসলাম প্রচার করা থেকে কখনোই থামবো না -- যতক্ষণ না আল্লাহ আমাকে বিজয় অথবা মৃত্যু দেন "]।

তিনি ছিলেন নীতিপরায়ন মানুষ। তিনি আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে ও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এমন কিছুর কামনা করতেন । কঠিনতম দু:সময়েও তিনি শুধু আল্লাহর সাহায্যই কামনা করতেন । তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহ তাঁকে ও বিশ্বাসীদেরকে জয়ী করবেন। আল্লাহ তাঁকে ও বিশ্বাসীদেরকে সমর্থন করেছেন ও অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

উম্মী হওয়ার পেছনে ঐশ্বরিক রহস্য :

রাসুল (দঃ) যখন ওহী লাভ করেন , তখন তিনি লিখতেও জানতেন না, পড়তেও পারতেন না। এককথায় উম্মী। উম্মী অবস্থায় কুরআন লাভ একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রমাণ যে তিনি হলেন সত্যিই রাসুল (দঃ)। অবিশ্বাসীরা যদিও জানতো যে রাসুল (দঃ) কে কোন মানুষ কখনো লেখাপড়া শেখায় নি , তবুও কাফিররা এটা মেনে নেয় নি যে কুরআন আল্লাহর বাণী। তারা বরং অভিযোগ তুলে যে রাসুল (দঃ) নিজেই এটা লিখেছেন। অথচ ঐ কাফিরা নবুয়ত প্রাপ্তির অনেক আগে থেকেই রাসুল (দঃ) কে চিনতো ও ভালভাবেই জানতো যে কুরআন লেখার মতো জ্ঞান তাঁর নেই।

কুরআনে আল্লাহ বলেন : " তোমার কাছে ফিরিশতা পাঠিয়েছি আমার আদেশে ; তুমি জানতে না কিতাব কী , ঈমান কী ; আমি কুরআনকে করেছি নুর যাকে দিয়ে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করি। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ দেখাও --"(সুরা শুরা; ৪২ : ৫২)।

" ...আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন কিতাব ও জ্ঞান ও শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার উপর আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ রয়েছে "(সুরা নিসা; ৪ : ১১৩)

রাসুল (দঃ) মানবজাতির কাছে কুরআন পৌঁছে দেন স্রষ্টার কাছ থেকে আসা বাণী হিসাবে। তিনি কখনোই নিজেকে লেখক বা কবি হিসাবে দাবী করেন নি। তিনি মানুষকে মনে করিয়ে দিতেন যে নবী হওয়ার বহু আগে থেকেই তারা তাঁকে চিনে---" আল্লাহ না চাইলে আমি

তোমাদের কাছে কুরআন তেলাওয়াত করতাম না ও তিনিও তোমাদেরকে এটা জানাতেন না। কুরআন আসার অনেক আগে থেকেই তো আমি তোমাদের মাঝে দীর্ঘদিন থেকে আছি; তোমরা কী ভেবে দেখবে না ? ” (সুরা ইউনুস; ১০: ১৬)

উম্মী হওয়ার পরেও রাসুল (দ:) খুবই সার্থকভাবে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে নিয়ে যান। আগেকার আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলের জ্ঞান ওহীল মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:)কে দান করেন। আল্লাহ যখন রাসুল (দ:) কে কুরআনের বাণী পাঠান , তখন আগের কিতাব ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। আল্লাহর ওহী ছাড়া রাসুল (দ:) এর পক্ষে অতীতের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব ছিল না।

রাসুল (দ:) এর গুণাবলী সম্পর্কে আল গাজ্জালী আরো বলেন:
তাঁর স্বভাব ও আচরণ , কাজ , অভ্যাস , ব্যবস্থাপনা , বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর ব্যবহার , সবাইকে সত্য পথ দেখানো ,কঠিন কঠিন বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার উত্তর দান , মানুষের কল্যাণে তাঁর ক্লান্তিহীন চেষ্টা , শরীয়াহ আইনের প্রতি তাঁর দক্ষ নেতৃত্ব -- এই সব কিছুই এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে যে কোন মানুষের পক্ষে এসব করা সম্ভব নয় ---স্রষ্টার অদৃশ্য শক্তির সাহায্য ছাড়া। কোন মিথ্যাবাদী বা ভন্ড মানুষের পক্ষে এরকম করা অসম্ভব।

রাসুল (দ:) এর শাসনতন্ত্র ও চারিত্রিক গুণাবলী দেখে মানুষ সাক্ষ্য দিয়েছে যে তিনি আল্লাহর পাঠানো এক মহান সত্যবাদী মানুষ। আল্লাহ তাঁকে এসব গুণ দান করেছেন যদিও তিনি ছিলেন উম্মী ও বাস করতেন অশিক্ষিত আরবদের মাঝে। নিরক্ষর , এতিম ও প্রতিপত্তিহীন হওয়ার পরেও তিনি কিভাবে এত সুন্দর স্বভাব – চরিত্র এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলেন জাগতিক বা ঐশ্বরিক শিক্ষা ছাড়া ? আগেকার নবী ও রাসুলদের (দ:) সম্পর্কে সত্য , সঠিক জ্ঞান এটাই প্রমাণ করে যে তিনি সত্যিই আল্লাহর রাসুল (দ:) । কেননা , তিনি ওহীর মাধ্যমেই এসব জানতে পারেন। ওহীর জ্ঞান ছাড়া তিনি আর কিভাবে এসব জানবেন ? (টীকা ১৩)

যারা তাঁকে চিনতো --এমন কী অবিশ্বাসীরাও জানতো যে রাসুল (দ:) কখনো জ্ঞানী মানুষদের কাছ থেকে কোন শিক্ষা পান নি । কাজেই রাসুল (দ:) এর বার্তার মধ্যে যে জ্ঞান ছিল , তা কেবল স্রষ্টার কাছ থেকে অলৌকিক উপায়েই পাওয়া সম্ভব।

আল্লাহ কুরআনে বলেন : “ তুমি এর আগে কোন বই পড়ো নি বা লেখো নি । যদি এমনটি হতো তাহলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করতো” (সুরা আনকাবুত ; ২৯ : ৪৮)

এনসাইক্লোপিডিয়া অব সিরাহ জানায় মুহাম্মাদ (দঃ) এর মহান জ্ঞানই প্রমাণ দেয় যে তিনি আল্লাহর রাসুল (দঃ) । মুহাম্মাদ (দঃ) একজন উম্মী -- না তিনি পড়তে জানতেন না জানতেন লিখতে। আজীবন তিনি যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বেড়ে উঠেছেন , যারা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল ও মক্কার জনগণ --কেউই কখনো দেখে নি যে তিনি কোন বই বা কলম ধরেছেন।

তাই তাঁর কাছে যা নাজিল হয়েছে --জ্ঞানের সমুদ্র কুরআন সত্যিই অলৌকিক কিছু। এতে রয়েছে আগের সব আসমানী কিতাবের অমুল্য তথ্য সম্পদ ; নবী ও রাসুলদের (দঃ) কাহিনী ; বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস , ইতিহাস , সভ্যতা , সংস্কৃতি , অর্থনীতি , রাজনীতি ও নৈতিক মুল্যবোধ -- নিরক্ষর হওয়া সত্বেও এত সব তথ্য সমৃদ্ধ বই অবিশ্বাসীদের সামনে পেশ রাসুল (দঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ -(টীকা ১৪)

ইয়াহুদী পন্ডিতরা রাসুল (দঃ) কে চিনেছিল :-

ইয়াহুদী ও খৃস্টানদেরকে কুরআনে ‘আসমানী কিতাবের মানুষ ’ বলা হয়েছে। এদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচরণে অনেক দোষ-ত্রুটি ঢুকে পড়েছে ; তবুও তারা এমন ধর্ম পালন করছে যা মুলত: আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছিল।

তাওরাত ও ইঞ্জিল আল্লাহর পাঠানো কিতাব যদিও পরে সময়ের সাথে সাথে এগুলি বদলে যায়। আল্লাহ জানান , মানবজাতির কাছে কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব হিসাবে এসেছে। এই বই আগেকার কিতাবগুলির সমর্থনকারী ।

নীচের আয়াতে আল্লাহ বনী ইসরাইলদের উদ্দেশ্যে বলেন :

“আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তাতে ঈমান আনো যা তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে তার সত্যায়নকারী। কিতাব অস্বীকারকারীদের মধ্যে তোমরা প্রথম হয়ো না ও তুচ্ছ মুল্যের বদলে আমার আয়াত বিক্রি করো না । তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো (বাকারা ; ২:৪১)

তাওরাত ও ইনজীলে একজন নিরক্ষর নবীর আসার কথা বলা হয়েছিল। তাই এসব বইয়ের পন্ডিতরা নবীর (দ:) আগমণ সম্পর্কে জানতেন ও কুরআন যে স্রষ্টার সর্বশেষ কিতাব – সেটাও তাদের জানা ছিল।

" আগেকার মানুষদের কাছে আসা কিতাবগুলিতে অবশ্যই এ (কুরআন) সম্পর্কে বলা আছে। তাদের জন্য এ কি এক নিদর্শণ নয় যে বনী ইসরাইলের পন্ডিতরা এ সম্পর্কে জানে ? "(সুরা শুয়ারা ; ২৬ : ১৯৬–১৯৭)

বিশিষ্ট তফসিরবিদ ইমাম সৈয়দ হাওয়া তাঁর আল আসাস ফিত তাফসির বইতে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন -- এটা নিশ্চিত যে আগেকার কিতাবগুলিতে কুরআনের অস্তিত্ব আছে। অন্য কথায় , আগের ধর্মীয় বইগুলিতে কুরআনের উল্লেখ আছে।
আগের নবীগণ তাঁদের জাতির কাছে যে বার্তা পৌঁছে দেন তা আল্লাহরই বাণী।

মধ্যপন্থী ও সৎ ইয়াহুদী পন্ডিতেরা জানতো তাওরাত , জাবুর ও ইনজীলে কুরআনের কথাগুলিই আছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে কুরআনই হলো সর্বশেষ কিতাব ও এর প্রতিটি বাণী আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য।
তারা চিনতে পেরেছিল যে আগের কিতাবগুলি যার কথা বলেছে --ইনিই সেই শেষ রাসুল (দ:) (টীকা ১৫)

রাসুল (দ:) এর আবির্ভাবের পর অনেক ইয়াহুদী ও খৃস্টান রাব্বি ও যাজকরা সাথে সাথেই চিনে নেয় যে এই সেই নিরক্ষর নবী -- তাদের আসমানী কিতাবগুলিতে যার সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে।

রাসুল (দ:) ওহীর মাধ্যমে তাওরাত , ইনজীল ও বনী ইসরাইলের ইতিহাস জানতেন। কুরআনে সুরা বাকারায় এ নিয়ে বলা হয়েছে :

" হে বনী ইসরাইল ; তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহের কথা মনে করো। আমাকে যে কথা দিয়েছিলে তা পুরণ করো , আমিও তোমাদেরকে দেয়া আমার কথা রক্ষা করবো । তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করো।

আমি যে কিতাব পাঠিয়েছি তাতে ঈমান আনো যা তোমাদের কিতাবের সত্যায়নকারী। তোমরা এর প্রথম প্রত্যাখানকারী হয়ো না ও তুচ্ছ মুল্যে আমার আয়াত বিক্রি করো না। শুধু

আমাকেই ভয় করো । সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশিয়ে ফেলো না ও জেনে শুনে সত্যকে লুকিয়ে রেখো না। (বাকারা; ২: ৪০-৪২)

রাসুল (দ:) যখন তাদেরকে কুরআনের এই আয়াতগুলি শোনালেন , তখন ইসরাইলীদের জ্ঞানী মানুষরা তাদের বহু প্রতীক্ষিত নবীকে চিনতে পারে। আসমানী কিতাবের মানুষেরা দেখলো ইনিই স্রষ্টার রাসুল (দ:) ও সবসময়ই ইনি সত্যি বলছেন। রাসুল (দ:) এর স্বভাব ও জীবন-যাপন সবাইকে বুঝিয়ে দেয় ইনিই সেই নবী তাওরাত ও ইনজীলে যার কথা বলা হয়েছে।

কুরআনে বলে : "যারা উম্মী রাসুলকে মেনে চলে যার উল্লেখ তারা পেয়েছে তাওরাত ও ইনজীলে , যিনি তাদেরকে ভাল কাজ করতে বলেন ও খারাপ কাজে নিষেধ করেন , পবিত্র জিনিষকে হালাল ও অপবিত্র বিষয়কে হারাম
করেন ;যিনি তাদের ভারী বোঝা ও শৃঙ্খল (অর্থাৎ বিভিন্ন শাস্তি হিসাবে ইয়াহুদীদের উপর যে কঠিন বিধি-বিধান ছিল অথবা শত্রুর অত্যচার ও পরাধীনতা) থেকে মুক্তি দিয়েছেন ।

যারা এই রাসুলের উপর ঈমান এনেছে , তাঁকে সম্মান ও সাহায্য করে এবং তাঁর কাছে পাঠানো নুরের অনুসরণ করে -- তারাই সফল । " (সুরা আরাফ ; ৭: ১৫৭)

ইসলামী পন্ডিত ওমর নাসুতি বিলমান তার কুরআনের তফসীর বইতে বলেন : এই আয়াত প্রকাশ করে যে যারা শেষ নবীর (দ:) অনুসারী , তারা বিভিন্ন সৎ গুণের অধিকারী , ভাল ভাল কাজ করে এবং এই দুনিয়া ও পরকালের উত্তম পুরষ্কার তারা লাভ করবে।

যে নবী (দ:) কখনো কিছু পড়েন নি বা লেখেন নি- তাঁর উপরই নাজিল হয়েছে আসমানী কিতাব - যাতে রয়েছে অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞান --যারা এই রাসুল (দ:) কে মেনে নেয় ও অনুসরণ করে , তারা রাসুল (দ:) এর দলভুক্ত হওয়ার সম্মান লাভ করে। তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ নবীর (দ:) নাম বা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ আছে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে রাসুল (দ:) এর নাম ও বৈশিষ্ট্যের কথা আসমানী কিতাবগুলিতে বলা হয়েছে। না হলে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এমন দাবী নিশ্চয়ই করতেন না । তাছাড়া তাঁর এই দাবী প্রত্যাখান করার সুযোগও অমুসলিমরা তখন পেয়ে যেত। তিনি এমন একজন মহান রাসুল ছিলেন যিনি মানবজাতিকে উপদেশ দিতেন সত্যের পথে আসতে , এক আল্লাহর নির্দেশ মান্য

করতে , যথার্থ বিশ্বাস ও মুল্যবোধ অর্জন করতে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে দয়া করতে বলতেন (এবং অন্যায় করতে নিষেধ করতেন) (টীকা ১৬) ।

শেষ নবী (দ:) সম্পর্কে যে ভবিষ্যত বাণী আসমানী কিতাবের মানুষের কাছে করা হয়েছিল , এটা রাসুল (দ:) সম্পর্কিত মুযেজা। বিভিন্ন জিনিষ প্রত্যক্ষ করে এই কিতাবীদের মধ্যে যারা বিশ্বাস ও বুদ্ধি-বিবেচনাকে কাজে লাগায় , তারা এই সত্যকে নিশ্চিত করে।

৬। মুহাম্মাদ (দ:) এর জীবনের কিছু মুযেজা-

আল্লাহর পক্ষ থেকে সারা জীবনভর রাসুল (দ:) কে অনেক মুযেজা দান করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কুরআন নাজিল হওয়া ও কুরআন নিজেই সব মুযেজার মধ্যে সেরা। রাসুল (দ:) এর অসাধারণ চরিত্র , তার কাজ এমন কী হাদীসও মুযেজা। এছাড়া আরো অনেক অলৌকিক ঘটনা রাসুল (দ:) এর জীবনে ঘটেছে যার কথা কুরআন ও রাসুলের জীবনীতে বলা হয়েছে।

নীচে অল্প কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা বলা হলো :

রাতের অভিযান ও আকাশ ভ্রমণ (শবে মেরাজ)

রাসুল (দ:) এর জীবনে যে সব আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে , তার মধ্যে অন্যতম হলো শবে মেরাজ। এটি হিজরতের এক বছর সাত মাস আগে ঘটে। কুরআনের সুরা ইসরার প্রথম আয়াতে শবে মেরাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে --

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর দাসকে রাত্রিতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ভ্রমণ করান যার চারদিক আমি করেছি বরকতময় , তাঁকে আমার কিছু নিদর্শন দেখানোর জন্য । নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শুনেন , সব দেখেন (সুরা ইসরা ; ১৭ : ১)

হাদীসে বলা হয়েছে রাসুল (দ:) কাবার পাশে ঘুমাচ্ছিলেন । তখন জিবরাইল (আ:) তাঁর কাছে আসে ও একটি সাদা প্রাণী (গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি) বোরাকের উপর তাঁকে বসান।

এরপর রাসুল (দঃ) বোরাকে চড়ে মক্কার মসজিদ উল হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদ উল আকসায় যান (আকসা শব্দের অর্থ
দুরবর্তী)।

এই দুই মসজিদের মধ্যে দুরত্ব ১২৩৫ কিলোমিটার । মসজিদ উল আকসা থেকে রাসুল (দঃ) তাঁর রাত্রিকালীন অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেন। সপ্ত আসমান ভেদ করে সিদরাতুল মুনতাহা (মহাকাশের সর্বোচ্চ সীমার কুল গাছের) কাছে ও এরপরে মহান স্রষ্টার কাছে তিনি যান। ইবনে কাসির বলেন কমপক্ষে ২৫ জন সাহাবী শবে মেরাজের কাহিনী রাসুল (দঃ) এর কাছ থেকে শুনেন। এই সংখ্যা ৪৫ জনও হতে পারে।

যাদের বর্ণনা সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বলে ধরা হয় তারা হলেন আনাস ইবনে মালিক , আবু হুরায়রা , আবু সৈয়দ আল খুদরী , মালিক ইবনে সাসা , আবু দার আল গিফারী , আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস , আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ এবং উম্মে হানী।

হাদীসে বিস্তারিত বলা হয়েছে রাসুল (দঃ) মেরাজে গিয়ে কী দেখেছিলেন। আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনায় মুসলিম শরীফ থেকে মেরাজে কী কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমরা জেনেছি। জিবরাইল (আঃ) এর সাথে রাসুল (দঃ) আসমান ভেদ করে আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময় বিভিন্ন নবী ও রাসুল (দঃ) এর দেখা পান। এরা হলেন আদম, ঈসা , ইয়াহিয়া , ইউসুফ , ইদরিস , হারুণ , মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)।

এরপর রাসুল (দঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছান ও ওহী লাভ করেন --- “ রাসুল বিশ্বাস করেন তাঁর কাছে যা ওহী এসেছে তাতে ও মুসলমানরাও । তাঁরা বিশ্বাস রাখে আল্লাহ , ফিরিশতা , আসমানী কিতাব ও আল্লাহর রাসুলদের উপর । তাঁরা বলে , আমরা রাসুলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। তাঁরা বলে , আমরা শুনেছি ও কবুল করেছি। আমরা আপনার ক্ষমা চাই , হে আমাদের পালনকর্তা। আপনার কাছেই আমরা ফিরে যাবো ”(বাকারা ; ২: ২৮৫)।

এরপর রাসুল (দঃ) আল্লাহর কাছে যান ও সেখানেই তিনি আদেশ লাভ করেন যে মুসলমানরা এখন থেকে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। আকাশে সিদরাতুল মুনতাহায় রাসুল (দঃ) এর যাওয়া নিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে :

“ নিশ্চয়ই সে { মুহাম্মাদ (দঃ) তাকে { জিবরাইল (আঃ) } কে আরেকবার দেখেছিলো শেষ সীমানার কুল গাছের কাছে ; যার পাশে আছে জান্নাত ; যা দিয়ে ঢাকা থাকার কথা (অর্থাৎ আল্লাহর নুর) দিয়ে কুল গাছটি ঢাকা ছিল ; তাঁর দৃষ্টি বিভ্রাট ঘটে নি বা দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয় নি। সে তাঁর প্রভুর কিছু সেরা নিদর্শন দেখেছে। (সুরা নাজম; ৫৩: ১৩-১৮)

ফিরে আসার পর রাসুল (দঃ) কুরাইশদের বললেন গত রাতে কী ঘটেছে। অবিশ্বাসীরা এমন কী কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলমানরাও রাসুল (দঃ) এর মুযেজায় অবিশ্বাস করলো । তারা আবু বকর (রাঃ) এর কাছে গিয়ে রাসুল (দঃ) এর নামে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনলো। আবু বকর (রাঃ) কে কাফিররা প্রশ্ন করলো শবে মেরাজের ঘটনা তিনি সত্য বলে মানেন কী না ও রাসুল (দঃ) কে তিনি এখনো বিশ্বাস করেন কি না ? জবাবে আবু বকর (রাঃ)জানান , যদি রাসুল (দঃ) এটা বলে থাকেন , তাহলে হ্যাঁ , আমি তাঁকে বিশ্বাস করি।

আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর প্রতি এই বিশ্বস্বতা ও আনুগত্যের জন্য তাকে হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) সিদ্দিক (সম্পুর্ণ বিশ্বাসী) উপাধি দেন।

কাফিররা হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে নানা প্রশ্ন করে জানার জন্য যে তিনি সত্যি না মিথ্যা বলছেন। রাসুল (দঃ) তাঁদের সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন। হাদীসে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তারা জানতে চায় : মসজিদ উল আকসা দেখতে কেমন ? এদের মধ্যে কেউ কেউ জেরুজালেম সফর করেছিল ও এই মসজিদ দেখেছিল।

রাসুল (দঃ) পরে বলেন – " আমি যখন তাদেরকে মসজিদের বর্ণনা দিচ্ছিলাম , মনে দ্বিধা-সন্দেহ দেখা দেয় । তখন মসজিদ উল আকসাকে নিয়ে আসা হয় ও ইকাল বা আকিলের বাসার সামনে এনে রাখা হয়। আমি তখন ঐ মসজিদের দিকে তাকিয়ে বর্ণনা দিতে থাকি। "

রাসুল (দঃ) এর বর্ণনা শেষ হলে তারা বলে , খোদার কসম , এই উত্তর সঠিক (ইমাম আহমদ , মুসনাদ)

"আমার মনে আছে কুরাইশরা জানতে চাচ্ছিলো শবে মেরাজ সম্পর্কে। তারা প্রশ্ন করে বায়তুল মকদিস সম্পর্কে। আমি এ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না ---তখন আল্লাহ আমাকে দেখানোর জন্য বায়তুল মকদিসকে উপরে তুলে ধরেন। তখন কুরাইশরা যে প্রশ্নই করলো , আমি উত্তর দিতে পারলাম – (টীকা ১৭)

বলাই বাহুল্য এরপরেও কাফিররা রাসুল (দঃ) এর মেরাজকে অস্বীকার করলো ও প্রমাণ চাইলো। আল্লাহর সাহায্যে রাসুল (দঃ) তাদেরকে প্রমাণ দিলেন- যা তারা অস্বীকার করতে পারলো না।

তারা জানতে চেয়েছিল মেরাজের কোন প্রমাণ আপনার কাছে আছে ?

রাসুল (দঃ) উত্তরে বলেন , " কুরাইশদের একটি মরুযাত্রী দলের দেখা পাই আমি। এটা ছিল অমুক জায়গায় । ঐ দল আমাদেরকে দেখে ভয় পেয়েছিল এবং পথ বদল করে। ঐ দলের উটের পিঠে সাদা ও কালো বস্তা আছে। ঐ উটটি ভয়ে চিৎকার করে ও পড়ে যায় । " পরে যখন ঐ যাত্রী দল এসে পৌঁছায় , তখন কুরাইশরা তাদেরকে ঐ রাতের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করে। তারা উত্তরে তাই বলে যা রাসুল (দঃ) বলেছিলেন। –(টীকা ১৮)

রাতের ভ্রমণ ও আকাশে যাওয়া (ইসরা ওয়াল মেরাজ) রাসুল (দঃ) এর অন্যতম সেরা মুযেজা যা তাঁর বার্তাকে শক্তিশালী করে। মেরাজের ঘটনা সত্যি গুরুত্বপুর্ণ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কাফিররা সন্দেহ নিয়ে যত প্রশ্ন রাসুল (দঃ) কে করেছিল , আল্লাহ সে সবের উত্তর দিতে তাঁকে সাহায্য করেন। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে রাসুল (দঃ) সত্যবাদী।

আল্লাহ তাঁর রাসুল (দঃ) এর জন্য চাঁদকে দুই টুকরো করেন –

আরেকটি অসাধারণ মুযেজা যা রাসুল (দঃ) কে দান করা হয় তা হলো চাঁদকে দুই টুকরো করা। কুরআনে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে সুরা কামারে --" কেয়ামতের সময় কাছেই এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে "
(৫৪ : ১)।

কুরআনে ' এবং চাঁদ বিদীর্ণ হলো ' --- এই আয়াতে দুটি শব্দ বিদীর্ণ ও চাঁদ ব্যবহৃত হয়েছে (ওয়াল সাকা আল কামার)।

বিদীর্ণ শব্দের মুল অর্থ ভাগ করা/ পৃথক করা / বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি। চাষ করার পর যখন মাটি ভেদ করে শস্য জন্মায় --- এই অর্থে এটির মুল শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই বিদীর্ণ শব্দকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় --- পৃথক হওয়া/ খন্ডে খন্ডে টুকরো হওয়া / আলাদা হওয়া ইত্যাদি।

চাঁদ ভাগ হওয়ার ঘটনা হাদীসের বিখ্যাত সংকলকদের
বইতে আছে। এরা হলেন ইমাম আল বুখারী , ইমাম মুসলিম , আত তিরমিযী , আহমেদ ইবনে হাম্বল , আবু দাউদ , আল হাকিম , আল বায়হাকী ও আবু নাউম------(টীকা ১৯)।

এ বিষয়ে কিছু নির্বাচিত হাদীস নীচে দেয়া হলো :

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বলেন , চাঁদ যখন দুই টুকরো হয় , তখন আমরা মীনাতে আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর সাথে ছিলাম। চাঁদের এক টুকরো পাহাড়ের পিছনে , অন্য টুকরো পাহাড়ের অন্য পাশে চলে যায়। আল্লাহর রাসুল (দঃ) আমাদেরকে বললেন , তোমরা সাক্ষী থাকো (মুসলিম)।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ জানান– আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর সময়ে চাঁদ বিদীর্ণ হয়। পাহাড় চাঁদের এক টুকরোকে ঢেকে রাখে , অন্য অংশ পাহাড়ের উপরে দেখা যায়। আল্লাহর রাসুল (দঃ) বলেন : তোমরা সাক্ষী থাকো (মুসলিম)।

আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর সময়ে চাঁদ দুই টুকরো হয়। চাঁদের এক অংশ পাহাড়ের উপরে , অন্য টুকরো পাহাড়ের পিছনে চলে যায়। তখন আল্লাহর রাসুল (দঃ) বলেন , এই মুযেজা দেখো (বুখারী)।

মক্কার লোকেরা আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট নিদর্শণ দেখতে চাচ্ছিলো । আল্লাহর অনুমতিতে রাসুল (দঃ) তাদেরকে চাঁদ টুকরো করে দেখান।

মক্কার লোকেরা রাসুল (দঃ) কে মুযেজা দেখাতে বলে। তাই দুইবার তিনি চাঁদকে বিচ্ছিন্ন করেন (মুসলিম)। স্পষ্ট মুযেজা দেখার পরেও মুর্তি পুজারী কুরাইশরা রাসুল (দঃ) কে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে। তারা যা দেখেছে তা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই তারা অভিযোগ করে যে এটা একটা
যাদু :

“ তারা কোন নিদর্শন দেখলে অন্যদিকে ফিরে যায় , বলে : এতো সেই আগেকার জাদু। তারা সত্যকে অস্বীকার করে ও নিজেদের খেয়াল ও ইচ্ছামতো চলে ; সব কিছুরই জন্য নির্দিষ্ট সময় আছে”(সুরা কামার; ৫৪: ২–৩)

“..আমাদের দৃষ্টি বিভ্রাট হয়েছে অথবা আমাদেরকে জাদুমন্ত্র করা হয়েছে ” (সুরা হিজর; ১৫ : ১৫)

বদিউজ্জামান সৈয়দ নুরসী জানান , এই মুযেজা অনেক সাহাবী দেখেছেন। তিনি বলেন , মুর্তি পুজারীরা এই মুযেজার সময় একেবারে অসহায় , শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

রাসুল (দঃ) এর অনেক গুরুত্বপুর্ণ মুযেজাগুলির মধ্যে এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতির (বংশ পরম্পরা অনেক মানুষ যে ঘটনা জেনেছে ও অন্যকে বলেছে। এই ঘটনায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই)। বিভিন্ন সুত্রে জানা যায় বলে যার সত্যতা সম্পর্কে মানুষ নিশ্চিত । বিভিন্ন সাহাবী এই মুযেজার কথা বলেন। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ইবনে মাসুদ , ইবনে আব্বাস , ইবনে উমর , আলী । আনাস ও হুদায়ফা। সবচেয়ে বড় ব্যপার , কুরআন পুরো বিশ্বকে জানাচ্ছে প্রধান একটি মুযেজার কথা
(সুরা কামার; ৫৪ : ১)।

এমন কী , ঐ সময়ের সবচেয়ে একগুঁয়ে কাফিররাও এই আয়াতকে অস্বীকার করতে পারে নি । তারা শুধু এটাই বলতে পেরেছিল , এটা যাদু। কাফিররাও জানতো যে চাঁদ টুকরো হয়েছে – (টীকা ২০)

নুরসী এই মুযেজার অন্তর্দশী , অতি সুক্ষ ব্যাখ্যায় আরো বলেন :–

মুযেজা ঘটে নবুয়তের প্রমাণ দিতে ও কাফিরদের বিশ্বাস করানোর জন্য –কিন্তু তাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করার জন্য নয়।

এই মুযেজার দরকার ছিল তাদেরকে বিশ্বাস করানোর জন্য যারা মুহাম্মাদ (দঃ) এর নবুয়ত লাভের কথা শুনেছে। এই মুযেজা দুনিয়ার সব এলাকা থেকে দেখতে পাওয়া বা এমনভাবে সবাইকে দেখানো যাতে কেউ এই ঘটনা অস্বীকার না করতে পারে --- এমনটি হলে তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর প্রজ্ঞা ও যে কারণে মানুষ দুনিয়ায় এসেছে , তার সাথে খাপ খেতো না। মানুষকে আল্লাহ বুদ্ধি– বিবেচনা দান করেছেন , ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন।

বস্তুবাদী দার্শনিকরা যেমনটি বলে থাকে , সেরকমভাবে চাঁদকে খন্ডিত অবস্থায় কয়েক ঘন্টা রেখে সারা দুনিয়ার মানুষকে দেখালে এবং তা সব ঐতিহাসিকদের রেকর্ড থাকলে ঐ ঘটনা হয়তো জ্যোতির্বিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পেত।

এটা আর রাসুল (দঃ) এর মুযেজা থাকতো না বা তাঁর নবুয়তের প্রমাণ হতো না; অথবা হয়তো তখন এটাকে এমন এক মুযেজা হিসাবে মানুষ দেখতো যাকে কোনভাবেই অস্বীকার করতে না পেরে তারা এটা মানতে বাধ্য হতো---তাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আল্লাহ

দিয়েছেন , তার প্রয়োগ আর তারা ঘটাতে পারতো না। ফলে কয়লা ও হীরা { আবুল জাহল ও আবু বকর (রা:) } সব এক কাতারে চলে আসতো। দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য নষ্ট হতো -- (টীকা ২১)

রাসুল (দ:) কে গাছ উত্তর দিলো --

গাছ কিভাবে রাসুল (দ:) এর কথা শুনলো ও উত্তর দিলো সে নিয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন , এক লজ্জাবতী গাছ রাসুল (দ:) এর কথায় সাড়া দিয়ে বলে উঠে-- আল্লাহ এক , মুহাম্মাদ (দ:) তাঁর রাসুল ।

ইবনে উমর বলেন , আমরা রাসুল (দ:) এর সাথে এক সফরে ছিলাম । এক বেদুইন রাসুল (দ:) কে দেখে কাছে আসলে তিনি জানতে চান : বেদুইন , তুমি কোথায় যাচ্ছো ? লোকটি বলে : আমার পরিবারের কাছে। রাসুল (দ:) বললেন , তুমি কি ভাল কিছু চাও ? বেদুইন জানতে চাইলো - সেটা কী ? রাসুল (দ:) বললেন : তা হলো এই --- তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া যার কোন শরীক নেই ও মুহাম্মাদ (দ:) আল্লাহর দাস ও রাসুল।

বেদুইন বললো , আপনি যে সত্য বলছেন তার সাক্ষ্য কে দেবে ? রাসুল (দ:) তখন বললেন - ঐ লজ্জাবতী গাছটি সাক্ষ্য দেবে। গাছটি তখন নদীর তীর থেকে এগিয়ে আসতে লাগলো যতক্ষণ না রাসুল (দ:) এর একদম সামনে আসলো। রাসুল (দ:) গাছকে বললেন তিনবার সাক্ষ্য দিতে ও গাছটি ঠিক তাই করলো , তারপর নিজ জায়গায় ফিরে গেল (আদ দারিসী , আল বায়হাকী ও আল বাযযার) । (টীকা ২২)

এমন কী , জড় পদার্থ পাথরও রাসুল (দ:) কে অভিবাদন জানায় ও সাক্ষ্য দেয় যখন তিনি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । আলী ও অন্যরা বলেন : রাসুল (দ:) এর সাথে মক্কার সীমান্তে আমি হাঁটছিলাম । আমি দেখলাম রাসুল (দ:) যখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সব গাছ ও পাথরই বলছিলো , আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক্ , হে আল্লাহর রাসুল (দ:) (আল তিরমিযী) ।

আল্লাহর অনুমতিতে গাছ সরে যায় রাসুল (দঃ) এর সুবিধার জন্য। এ ধরণের অনেক ঘটনার মধ্যে একটি হলো – ইবনে ফারুক জানান যে তায়েফে সামরিক অভিযানের সময় রাসুল (দঃ) রাতে সফর করছিলেন ও একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। তখন তার চলার পথে পড়া একটি লট গাছ দুই ভাগ হয়ে যায় ও রাসুল (দঃ) ঐ গাছের ফাঁক দিয়ে চলে যান। গাছটি দুই ভাগ অবস্থায় সারাদিন ছিল । এটা অনেকেই জানে – (টীকা ২৩)

এই কাহিনী অনেকেরই জানা আছে যে রাসুল (দঃ) খুতবা দেয়ার সময় একটি খেজুর গাছে ভর দিতেন। যখন মসজিদের মিম্বার তৈরী হলো ও খেজুর গাছটির আর দরকার থাকলো না , তখন গাছটি কষ্টে আর্তনাদ করতে থাকে ও রাসুল (দঃ) এর প্রতি ভালবাসায় কাঁদতে থাকে।

জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন :মসজিদ বানানো হয়েছিল অনেকগুলি খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে। মসজিদে আসা মানুষদের সাথে কথা বলার সময় এই গুঁড়িগুলির একটির উপর রাসুল (দঃ) ভর দিতেন। যখন রাসুল (দঃ) এর জন্য মিম্বর তৈরী হলো , তখন আমরা শুনলাম গুঁড়িটি আওয়াজ করছে ঠিক যেন উটের মতো (বুখারী)-- (টীকা ২৪)

অফুরন্ত পানি ও খাবার–

আল্লাহ তাঁর রাসুল (দঃ) কে সারা জীবন ধরেই নানাভাবে রহমত দান করেছেন । রাসুল (দঃ) স্পর্শ করেছেন বা দোয়া করেছেন এমন কিছুতে আল্লাহর রহমতে বরকত বাড়তো।

হাদীসে এমন ঘটনার কথা বলা আছে । যখন দেখা যাচ্ছিলো পানি ও খাবার খুবই কম , তখন রাসুল (দঃ) এর উপস্থিতিতে অফুরন্ত পানি ও খাবার পাওয়া যায় । এশবার পানি এত কম ছিল যে সাহাবীরা ওজুও করতে পারছিলেন না। রাসুল (দঃ) কে আল্লাহ মুযেজা দান করলেন। ফলে সেই পানিতেই অসংখ্য মানুষ ওজু করলেন।

আনাস ইবনে মালিক বলেন : আসরের নামাজের সময় আমি রাসুল (দঃ) কে দেখলাম । ঐ সময় মানুষ ওজুর জন্য পানি চাচ্ছিলো কিন্তু কোথাও পানি খুঁজে পেল না। তখন আল্লাহর রাসুল (দঃ) নিজের হাত সামান্য পানির পাত্রে রাখলেন। এরপর তিনি সবাইকে বললেন ঐ পাত্র থেকে পানি নিয়ে ওজু করতে। আনাস আরো বলেন , আমি দেখলাম

রাসুল (দঃ) এর আঙুল থেকে পানি বের হচ্ছে আর সবাই একে একে ওজু করলো। (মুসলিম , বুখারী) (টীকা ২৫)

সহীহ হাদীসে অন্য একটি ঘটনার কথা আছে। আল হুদায়বিদায় ওজুর পানি পাওয়া যাচ্ছিলো না। রাসুল (দঃ) তখন পানির পাত্রে আঙুল ঢুকান। এরপর পনেরো হাজার লোক সেই পানি দিয়ে ওজু করে । (টীকা ২৬) (বর্ণনাকারী : জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ)

রাসুল (দঃ) এর দুই আঙুলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ার আরো কিছু ঘটনা জানা যায়। ইবনে আব্বাস বলেন : এক সফরে মুসলিম বাহিনীর জন্য কোন পানি ছিল না। সকালে রাসুল (দঃ) কে একজন বললো , হে আল্লাহর রাসুল (দঃ) , সেনাদলের কাছে কোন পানি নেই। রাসুল (দঃ) তখন জানতে চাইলেন , " অল্প একটু পানিও কি হবে না ? " হ্যাঁ । একটি পাত্রে তখনই অল্প পানি আনা হলো । রাসুল (দঃ) পাত্রের মুখে আঙুল প্রসারিত করলেন । পানি তাঁর আঙুল থেকে ঝর্ণার মতো প্রবাহিত হতে থাকলো।

রাসুল (দঃ) বেলালকে আদেশ দিলেন সবাইকে ডাকার জন্য -- বরকতময় পানির কাছে আসো (ইবনে হাম্বলে , আল বায়হাকী , বাযযার , আত- তাবারানী ও আবু নায়ীম) --- টীকা ২৭

যিয়াদ ইবনে আল হারিখ আস সুদাই বলেন - রাসুল (দঃ) সফরে ছিলেন । সকাল হওয়ার আগে তিনি থামলেন । তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন , হে সুদা গোষ্ঠির ভাই , পানি কি আছে ?

আমি বললাম , খুব অল্প পানি যা আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না। তিনি আদেশ করলেন , একটি পাত্রে পানি ঢেলে আমার কাছে আনো। আমি পানি আনলাম । রাসুল (দঃ) তাঁর হাত পানিতে রাখলেন । আমি দেখলাম দুই আঙুলের মধ্য দিয়ে ঝর্ণার মতো পানি বের হচ্ছে। রাসুল (দঃ) তখন আদেশ দিলেন : যে সব সাহাবীদের পানির দরকার , তাদেরকে ডাকো। আমি ডাকলাম । যার যত পানি দরকার ছিল , তা সে নিতে পারলো।

আমরা বললাম , " হে আল্লাহর রাসুল (দঃ) । আমাদের একটি কুপ আছে। শীতে সেখানে যথেষ্ট পানি থাকে , কিন্তু গরমের সময় আমরা কুপ থেকে পানি পাই না--- পানির খোঁজে অন্য কোথাও যেতে হয়। আমরা এখন মুসলমান হয়েছি। আমাদের চারপাশে শত্রু। আপনি দয়া করে আমাদের প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন যাতে এই কুপের পানি বেড়ে যায়। তাহলে

আমাদেরকে আর পানির জন্য দুরে ঘোরাফেরা করতে হবে না। এই কুপের কাছেই আমরা তাহলে সবসময় থাকতে পারবো । ”

রাসুল (দঃ) সাতটি পাথর আনার জন্য বললেন । তিনি হাতের মধ্যে পাথরের টুকরোগুলি ঘষলেন ও দোয়া করলেন। তারপর আদেশ দিলেন : এই পাথরগুলি নিয়ে যাও । কুপের মধ্যে আল্লাহর নাম নিয়ে এক এক করে পাথরগুলি ফেলে দাও । ” আমরা তাই করলাম । এরপর আর কখনো আমরা কুপের নীচ দেখতে পারি নি (অর্থাৎ কুপ কখনো শুকিয়ে যায় নি --- সবসময় তাতে পানি থাকতো।)

{ আল হারিথ ইবনে উসামাহ -- মুসনাদ গ্রন্থ ; আল বায়হাকী ও আবু নায়ীম) – টীকা ২৮

আরেকটি হাদীসে আছে রাসুল (দঃ) পা দিয়ে আঘাত করার পর ঐ জায়গা থেকে প্রচুর পানি বের হয়। আমর ইবনে শুয়াইব জানান , একবার রাসুল (দঃ) এর সাথে তিনি যাচ্ছিলেন। তখন আবু তালিব বললেন , পিপাসা পেয়েছে কিন্তু আমার কাছে কোন পানি নেই। রাসুল (দঃ) তখন মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করলেন । মাটির নীচ থেকে পানি বের হতে থাকলো । রাসুল (দঃ) বললেন , পান করো (টীকা ২৯)

একইভাবে সাহাবীরাও বলেছেন যে রাসুল (দঃ) এর উপস্থিতিতে কখনোই পানি ও খাবার কম পড়তো না ও সবাই পেট ভরে খেতে পারতো।

আনাস একটি ঘটনা বর্ণনা করেন : “ রাসুল (দঃ) এর বিয়ের পর আমার আম্মা রাসুল (দঃ) ও তাঁর স্ত্রীর জন্য কয়েকটি খেজুর ও অল্প কিছু মাখন দিয়ে খাবার তৈরী করেন । আমি সেটা একটি পাত্রে করে নিয়ে যাই। রাসুল (দঃ) বলেন : এটা নীচে রাখো ও অমুক অমুককে ও যার সাথে দেখা হয় তাকেই ডাকো। ”

আমি সবাইকে দাওয়াত দিলাম ও সুফফাহ (মসজিদে নব্বী সংলগ্ন বারান্দা যেখানে গরীব মুসলমানরা ঘুমাতো) ও কামরা ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই ডাকতে বাদ দিলাম না। রাসুল (দঃ) নিজের সামনে পাত্রটি এনে তিনটি আঙুল খাবারের মধ্যে রাখলেন। মানুষ

এসে খাওয়া শুরু করলো ও চলে গেল। পাত্রটি সেরকমই ভরা থাকলো যেমনটি প্রথমে ছিল। মানুষ ছিল ৭১ বা ৭২ জন (মুসলিম ও বুখারী) – টীকা ৩০

একবার আবু আইউব শুধুমাত্র রাসুল (দঃ) ও আবু বকর (রাঃ) খেতে পারবেন – এই পরিমাণ খাবার বানান। তিনি পরে বলেন , রাসুল (দঃ) তাকে আনসারদের মধ্য থেকে ত্রিশজনকে দাওয়াত দিতে বলেন । ঐ ত্রিশজন এসে খেয়ে চলে যাওয়ার পর রাসুল (দঃ) বললেন , আরো ষাটজনকে ডাকো। তারাও খেয়ে চলে যাওয়ার পর রাসুল (দঃ) বললেন আরো ৭০ জনকে ডাকো। এরপর তারা খাওয়ার পরেও বেশ কিছু খাবার রয়ে গেল।

রাসুল (দঃ) কে সম্মান প্রদর্শণ ও মুসলমান না হয়ে এরা কেউ–ই চলে যায় নি। আবু আইউব বলেন , মোট ১৮০ জন ঐ খাবার খেয়েছিল (আল তাবারাণী ও আল বায়হাকী) -- টীকা ৩১

আবু হুরায়রা আরেকটি ঘটনা জানান , মসজিদে যত মানুষ ছিল সবাইকে রাসুল (দঃ) দাওয়াত দিতে বললেন। তিনি সবাইকে জড়ো করলেন ও একটি পাত্র রাখলেন সবার সামনে । সবাই পেট ভরে খেয়ে চলে গেল । পাত্রে খাবার একই রকম রয়ে গেল --- শুধু তার মধ্যে আঙুলের দাগ দেখা যাচ্ছিলো । টীকা ৩২

এসব উদাহরণ হলো অল্প কিছু মুযেজা যা আল্লাহ তাঁর রাসুল (দঃ) কে দান করেন। রাসুল (দঃ) এর জীবনে এমন কোন দিক নেই যা মুযেজা ছাড়া।

একেবারে অসাধারণ তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই এমন মুযেজা যেমন আকাশে ভ্রমণ , চাঁদ ভাগ করা ইত্যাদি থেকে শুরু করে প্রায় সময়ই সংঘটিত মুযেজা যেমন গাছের সালাম জানানো ইত্যাদি ঘটেছে রাসুল (দঃ) এর জীবনে। এসব মুযেজা আল্লাহর বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করা , বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় করা ও কাফিরদের সত্য গ্রহণে দাওয়াত দেয়। অবশ্য আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন । তাই মুযেজা দেখার পরেও সবাই তাতে বিশ্বাস আনে নি। রাসুল (দঃ) কখনোই দাবী করেন নি যে মুযেজা প্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁর আছে। এসব আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। রাসুল (দঃ) ছিলেন একজন বরকতময় মানুষ। তাঁর উপস্থিতিতে এত বরকত ছিল যে পানি ও খাবারের প্রাচুর্য দেখা দিতো। রাসুল (দঃ) মানুষের জন্য যে দোয়া করতেন তাতেও অনেক বরকত থাকতো।

৭। রাসুল (দঃ) এর দোয়া কবুল হতো–

অন্যান্য নবী ও রাসুল (দঃ) এর মতো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর সাথেও আল্লাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাসুল (দঃ) ছিলেন আল্লাহর বিশ্বস্ত দাস ও গভীর বিশ্বাস ও তাকওয়ায় অধিকারী। আল্লাহর রাসুল (দঃ) এর দোয়া কবুল করতেন। যার ফলে সাহাবী ও অন্য মানুষরাও বিভিন্ন মুযেজা দেখতে পেতো। রাসুল (দঃ) এর দোয়াতে অনেক বরকত ছিল। বিভিন্ন হাদীসে বলা আছে কিভাবে রাসুল (দঃ) এর দোয়া কবুল হয়েছিল।

বৃষ্টির জন্য রাসুল (দঃ) এর দোয়া (ইসতিসকা) যা আল্লাহ কবুল করেন :–

বৃষ্টির কল্যাণের জন্য রাসুল (দঃ) দোয়া করেন ও আল্লাহ কিভাবে তা কবুল করেন -- হাদীসে এ নিয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

আনাস বলেন : শুক্রবারে এক লোক মসজিদে আসে যখন রাসুল (দঃ) অন্যদের সাথে কথা বলছিলেন। সে বলে : হে আল্লাহর রাসুল (দঃ), আমাদের সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বাজারে নিয়ে যাওয়ার মতো পরিবহন আমাদের নেই, আমাদের জন্য বৃষ্টি হওয়ার দোয়া করুন। ”

রাসুল (দঃ) হাত তুললেন ও দোয়া করলেন : ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন ; ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন ; ও আল্লাহ ; আমাদেরকে বৃষ্টি দিন।
আল্লাহর কসম, ঐ সময় আকাশে কোন মেঘ ছিল না ও পাহাড় ও আমাদের মাঝে কোন ঘর–বাড়ি ছিল না। পাহাড়ের পিছন থেকে ঢালের মতো দেখতে এক মেঘ ভেসে এলো। আকাশের মাঝ পর্যন্ত সেই মেঘ আসতে না আসতেই বৃষ্টি শুরু হলো (বুখারী, মুসলিম)।

আনাস ইবনে মালিক বলেন : এক লোক রাসুল (দঃ) এর কাছে এসে বলে : “ হে আল্লাহর রাসুল (দঃ) ; আমাদের জীবজন্তু মরে যাচ্ছে ; উট এত দুর্বল যে সফরে যেতে পারছে না। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। ” রাসুল (দঃ) দোয়া করলেন আর বৃষ্টি হলো এক জুম্মা থেকে পরের জুম্মাবার পর্যন্ত (মুওয়াত্তা : মালিক)।

বৃষ্টি হয় ঐ শুক্রবার থেকে পরের শুক্রবার পর্যন্ত (বুখারী)।

রাসুল (দঃ) এর দোয়ায় যে সাহাবীরা উপকার পেয়েছিলেন :-

রাসুল (দঃ) ছিলেন একজন স্নেহশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ। তিনি সবসময়ই বিশ্বাসীদের ভাল-মন্দ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন থাকতেন।

কুরআনে এ বিষয়টির উল্লেখ আছে : " তোমাদের কাছে তোমাদের মাঝ থেকেই একজন রাসুল এসেছেন। তোমাদের দু:খে তিনি কষ্ট পান ; তিনি তোমাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ; তিনি বিনয়ী ও বিশ্বাসীদের প্রতি ক্ষমাশীল (সুরা তওবা; ৯ : ১২৮)

হাদীসে আছে , সাহাবীদের সুস্বাস্থ্য , নিরাপত্তা ও ঈমান নিয়ে রাসুল (দঃ) তাদেরকে সবসময় নানা পরামর্শ দিতেন। তিনি দয়া ও সহানুভূতি নিয়ে সাহাবীদের কাছে যেতেন। আল্লাহর কাছে সাহাবীদের জন্য রাসুল (দঃ) অনেক দোয়া করতেন। বিশ্বাসীদের জন্য রাসুল (দঃ) এর দোয়ার বিষয়ে আল্লাহ কুরআনে বলেন :

"...এবং তুমি ওদের জন্য দোয়া করো ; তোমার দোয়া তাদের চিন্তা দুর করে। আল্লাহ সব শুনেন , সব জানেন " (সুরা তওবা; ৯: ১০৩)

কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি যে রাসুল (দঃ) এর দোয়ার জন্য সাহাবীরা মনে শান্তি ও স্বস্তি পেত। হাদীসে আছে রাসুল (দঃ) কয়েকজন সাহাবীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ুর জন্য দোয়া করেন । আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করেন। যেমন , ইবনে কাসির থেকে জানা যায় - রাসুল (দঃ) এর দোয়ার বরকতে কিছু সাহাবী তারুণ্যে ভরপুর ছিল।

আরো বলা আছে , যাদের দীর্ঘ আয়ুর জন্য রাসুল (দঃ) দোয়া করেন , তারা শত বছর বাঁচে । - (টীকা ৩৩)

রাসুল (দঃ) একজন সাহাবীর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন : হে আল্লাহ , একে সুন্দর করুন ও এই সৌন্দর্য্যকে দীর্ঘস্থায়ী করুন । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেই সাহাবীর মুখ ছিল সুন্দর তরুণের মতো। - টীকা ৩৪

রাসুল (দঃ) সাহাবীদের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির জন্যও দোয়া করেছেন। আনাস বলেন : রাসুল (দঃ) দোয়া করেন - " হে আল্লাহ ; তাঁকে (আনাসকে) সম্পদ , সন্তান ও রহমত দান

করুন " । এরপর থেকে আনসারদের মধ্যে আমি সেরা ধনী ও আমার অনেক সন্তান (বুখারী , মুসলিম)।

আবদ উর রহমান ইবনে আউফকে আল্লাহর রাসুল (দ:) বলেন – আল্লাহ তোমাকে সম্পদশালী করুন । ইবনে সাদ ও আল বায়হাকী অন্য সুত্রে বলেন : আবদ উর রহমান বলেন , আমি এত ধনী হলাম যে কোন পাথর তুললেও জানতাম আমি এ থেকে সোনা , রুপা পাবো । (টীকা ৩৫)

আল বারাকীর জন্য রাসুল (দ:) দোয়া করেন। সে এতটা স্বচ্ছলতা অর্জন কওে যে সে জানতো মাটি বিক্রি করলেও তা থেকে তার আয় হবে (টীকা ৩৬)।
আবু উকাইল বলেন , তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে হিশাম বাজারে যান গম কেনার জন্য। সেখানে ইবনে আয যুবায়ের ও ইবনে উমরের সাথে তার দেখা হয়। তারা বলে , " আমাদের অংশীদার হও। কেননা , আল্লাহর রাসুল (দ:) তোমার প্রাচুর্যের জন্য দোয়া করেছেন "। দাদা তার গম থেকে ওদের সাথে ভাগাভাগি করলেন , এরপরও তার উটের বোঝা এতটুকু কমলো না । তিনি একই পরিমাণ গম নিয়েই বাড়ি ফিরলেন । (টীকা ৩৭)

৮। আল্লাহ অলৌকিকভাবে রাসুল (দ:) কে রক্ষা করেন –

আমরা এর আগে জেনেছি যে , আল্লাহর বাণী প্রচার করার অনেক আগে থেকেই রাসুল (দ:) সবার কাছে ' আল আমীন ' বা বিশ্বাসী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এটা তার সত্যবাদিতার স্বীকৃতি দেয়। মক্কার লোকেরা তাকে বিশ্বাস করতো ও নিজেদের সমস্যায় হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর মহত্ব ও ন্যায়পরায়নতার জন্য তাঁকে বিচারক মানতো।

নবী (দ:) ছিলেন বুদ্ধিমান , মুক্ত চিন্তার অধিকারী , সংবেদনশীল ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ও কাজে নির্ভুল । এসব গুণের কারণে তিনি সবারই সম্মান ও ভালবাসা লাভ করেন। অবশ্য যখন রাসুল (দ:) সবাইকে এক আল্লাহর পথে ডাকলেন ও মুর্তি পুজা বাদ দিতে বললেন , তখন কাফিরদের অনেকেরই মনোভাব রাতারাতি বদলে গেল। ন্যায় ও সত্যের পথে ডাকার পর তারা কিভাবে রাসুল (দ:) কে অপমানজনক উত্তর দেয় – কুরআনে তার উল্লেখ আছে :–

“তারা বলে : এই যে তুমি , যার কাছে কুরআন এসেছে , তুমি অবশ্যই পাগল। তুমি যদি সত্যই বলে থাকো , তবে আমাদের কাছে ফিরিশতা আনো না কেন ?”(সুরা হিজর ; ১৫: ৬–৭) ।

রাসুল (দ:) কে অপবাদ দেয়া হয় , উপহাস করা হয় ও নানারকম মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। এসব অবস্থার মুখোমুখি হয়েও রাসুল (দ:) শান্তভাবে কুরআনের শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। এই শিক্ষা মুর্তি পুজারীদের মধ্যে বিদ্বেষ ও রাগের জন্ম দেয়। কেননা , সমাজে চালু থাকা বিভিন্ন মিথ্যা ধারণা , অবিচার ও নির্যাতনের এরা ছিল সুবিধাভোগী দল।

এরা ভয় পেল যে যদি ইসলাম সব জায়গায় চালু হয় তবে সমাজে তাদের এখন যে উঁচু মর্যাদা আছে এবং সে সুবিধা ও ধন–সম্পদ তারা ভোগ করছে – সেসব আর থাকবে না। রাসুল (দ:) যে রহমত হিসাবে এসেছেন ও কী মুল্যবান শিক্ষা দিচ্ছেন – এটা কেবল সমাজের অল্প কিছু মানুষই বুঝতে পারলো।

রাসুল (দ:) ও তাঁর অনুসারীদের কষ্ট দিতে ও তাঁদের জীবনকে দুর্বিসহ করতে মুর্তি উপাসকরা সব রকম চেষ্টা চালালো। মুসলমানদের একঘরে করা হলো , শারীরিকভাবে নির্যাতন চালানো হলো এমন কী অনেককে মেরেও ফেলা হলো।

মক্কার লোকেরা এমন শত্রুতার মুখে রাসুল (দ:) ও তাঁর অনুসারীরা মদীনায় হিযরত করতে বাধ্য হন।

মদীনার আনসাররা রাসুল (দ:) ও অন্যান্য বিশ্বাসীদেরকে স্বাগত: জানায়। তবে ইয়াহুদীরা খুশীমনে স্বাগত: জানায় নি।

রাসুল (দ:) এর চরিত্রের শক্তিমত্তার বড় প্রমাণ হলো তিনি কখনো বিরোধীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন নি। মদীনায় রাসুল (দ:) শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজনক ছিল মুনাফিকরা। তারা ভান করতো যে তারা বিশ্বাসী এবং রাসুল (দ:) এর কাছে এসে তারা সময় কাটাতো। এরপর তারা কাফিরদের সাথে মিলে রাসুল (দ:) এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতো।

রাসুল (দ:) যে সময় সংগ্রাম করছিলেন , তখন বিভিন্ন দল তাঁর প্রচন্ড বিরোধীতা করে। এই চরম শত্রুতার মুখে এটা একটা অলৌকিক ব্যপার যে উহুদের যুদ্ধে কয়েকটি দাঁত হারানো ও আহত হওয়া ছাড়া রাসুল (দ:) এর আর তেমন কোন ক্ষতিই কখনো হয় নি।

কুরআনে আল্লাহ মানুষের ক্ষতি থেকে রাসুল (দঃ) কে রক্ষার কথা দেন :

" ...আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফিরদের হেদায়েত করেন না" (সুরা মায়িদাহ ; ৫ : ৬৭)।

বিভিন্ন মুযেজার মাধ্যমে আল্লাহর এই কথার বাস্তবায়ন ঘটে। কাফির , মুর্তি উপাসক ও মুনাফিকরা রাসুল (দঃ) এর ক্ষতি করতে চেষ্টা করতো। তারা রাসুল (দঃ) কে খুন করার চেষ্টাও করে কিন্তু সফল হয় নি। তাদের সব ষড়যন্ত্র , সব ফাঁদ ব্যর্থ হয়।

মুসলমানরা যখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হয় , তখন আল্লাহ সবসময়ই রাসুল (দঃ) কে রক্ষা করেন ও বিশ্বাসীদের তাদের থেকে বড় ও শক্তিশালী কাফির বাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেন। এর ফলে বিশ্বাসীদের ঈমান দৃঢ় হয় ও অনেক অবিশ্বাসী ইসলাম কবুল করে। রাসুল (দঃ) লক্ষ্য পুরণে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন। কুরআনে যেমনটি বলা হয়েছে-- এটা একটা মুযেজা।

হাদীসে রাসুল (দঃ) সম্পর্কে এ বিষয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে।

কাফিররা মক্কায় রাসুল (দঃ) কে মারতে পারে নি ---

ইসলামের প্রসারকে কাফিররা তাদের জন্য হুমকি মনে করতো , কেননা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও জাগতিক স্বার্থের ক্ষতি হবে। তারা দল বেঁধে আলোচনায় বসতো কিভাবে রাসুল (দঃ) কে প্রভাবিত করবে দীনের প্রচার বন্ধ করতে । এটা করতে না পেরে তারা ষড়যন্ত্র করে রাসুল (দঃ) কে খুন করার। আল্লাহ তাদের এসব ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন ও কুরআনে তা প্রকাশ করেন :

“কাফিররা ষড়যন্ত্র করছিল আপনাকে বন্দী , হত্যা অথবা বহিষ্কার করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করে আর আল্লাহও পরিকল্পনা করেন । অবশ্যই আল্লাহ সেরা পরিকল্পনাকারী” (সুরা আনফাল ; ৮: ৩০)।

প্রথমে কাফিররা রাসুল (দ:) কে জাগতিক বিষয়ের লোভ দেখায় যেমন সম্পদ ও ক্ষমতা। আল্লাহর বাণী আর প্রচার না করলেই তাঁকে পুরষ্কার হিসাবে এসব দেয়া হবে --- উথবাহ এরকম একটি অশোভন প্রস্তাব রাসুল (দ:) কে দেয়। ইবনে আবি সায়বাহ তার বই মাসনাদে এই প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেন । উথবাহ বলে – আপনি যদি সম্পদ চান , তাহলে আমরা সবাই মিলে এত অর্থ সংগ্রহ করবো যে আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হয়ে যাবেন।

যদি আপনি নেতৃত্ব চান , তাহলে আমরা আপনাকে নেতা হিসাবে মেনে নেব। আপনার মত ছাড়া কোন বিষয়েই আমরা কোন সিদ্ধান্ত নেব না। আপনি যদি রাজত্ব চান , তাহলে আমরা আপনাকে রাজমুকুট পরিয়ে আমাদের মাঝে রাজার সম্মান দেবো ।

কাফিররা যেহেতু সম্পদ ও ক্ষমতাকে খুবই মুল্য দিতো , তারা ভেবেছিল তাদের এসব লোভনীয় প্রস্তাব রাসুল (দ:) মেনে নেবেন।

“ কাফিররা চায় তুমি আপস করো , তাহলে তারাও আপস করবে
(সুরা কালাম ; ৬৮: ৯)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই রাসুল (দ:) যেহেতু গুরুত্ব দিতেন ও আল্লাহর কাছ থেকেই কেবল পুরষ্কার আশা করতেন, তিনি কাফিরদের সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দেন।

রাসুল (দ:) কে জাগতিক লোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচারে বিরত রাখতে না পেরে কাফিররা খুবই রেগে যায়। তারা তাকে বন্দী করার কথা ভাবে। ইবনে ইসহাক জানান , কুরাইশরা এক জায়গায় জড়ো হয় ও রাসুল (দ:) সম্পর্কে একে অন্যকে বলে : “ তোমরা জানো এ কতদুর পর্যন্ত এগিয়েছে। ” এই বলে তারা আলোচনা শুরু করে। একজন বলে : আমরা তাকে কোথাও বন্দী করে রাখি। কারো সাথে তাঁকে কথা বলতে দেবো না। যতদিন মারা না যায় , ততদিন সে

ওখানেই আটক থাকবে। ওকে আমরা খাবার দিবো যাতে সে বন্দীদশায় খেয়ে বাঁচতে পারে।

এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে কাফিররা একমত হতে পারলো না। এরপর তারা ঠিক করলো রাসুল (দঃ) কে নির্বাসনে পাঠাতে হবে। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবও উপযুক্ত নয় বলে বাদ গেল। কেননা , তারা বুঝতে পারলো হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) তাঁর নিজ গোত্রের সমর্থন পাবেন। ঐ আরব গোষ্ঠি এই ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবে। হযরত (দঃ) এর এক চাচা আবু জাহেল ইসলামের চরম বিরোধী ছিল। সে প্রস্তাব দেয় সবচেয়ে ভাল হয় যদি মুহাম্মাদ (দঃ) কে একেবারে মেরে ফেলা হয়। (টীকা ৩৮)

আপন ভাতিজার প্রতি তার এতটাই ঘৃণা ছিল যে , রাসুল (দঃ) কে প্রাণে মারার কোন সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাইলো না।

ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আল বুখারী বর্ণনা করেন : আবু জাহেল বলে – আমি যদি দেখি মুহাম্মাদ (দঃ) কাবায় নামাজ পড়ছে , আমি তার ঘাড় পা দিয়ে চেপে ধরবো। রাসুল (দঃ) যখন এটা শুনলেন তখন বললেন : সে যদি এটা করে , তবে ফিরিশতারা তাকে পাকড়াও করবে (বুখারী)। আবু জাহেল একটি বড় পাথর নিয়ে রাসুল (দঃ) কে মারার জন্য রওনা হয়। রাসুল (দঃ) সে সময় ইবাদাতে মগ্ন ছিলেন। রাসুল (দঃ) এর কাছে যাওয়ার আগেই আবু জাহেল ভীষণ ভয় পেয়ে পালিয়ে আসলো। তার হাত থেকে পাথর পড়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালিয়ে আসা সম্ভব – সে তাই করলো।

কুরাইশরা তার কাছে ছুটে গেল , জানতে চাইলো সে কেন দৌড়ে পালিয়ে আসলো ? আবু জাহল জানায় : এক ভয়ংকর উট আমার সামনে আসে ; উটটির মাথা , কাঁধ খুবই বড় , উটটির দাতগুলি ভয়ানক যেন আমি আর এগুলেই আমাকে কামড়ে খেয়ে ফেলবে। পরে রাসুল (দঃ) সাহাবীদের জানান উটটি আর কেউ নয় বরং জিবরাইল (আঃ)। যদি আবু জাহল আর এগুতো তাহলে জিবরাইল (আঃ) তাকে মেরে ফেলতো(টীকা ৩৯)।

রাসুল (দঃ) যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন , তখনো কাফিররা তাঁকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়। তারা সব গোষ্ঠির তরুণদের ডাকলো রাসুল (দঃ) কে খুন করার জন্য। তারা সবাই অস্ত্র হাতে রাসুল (দঃ) এর বাসার সামনে জড়ো হলো। খুনের পরিকল্পনা ছিল এমন যে সবাই একসাথে রাসুল (দঃ) এর উপর ঝাপিয়ে পড়বে ও আঘাত করবে। ফলে রাসুল (দঃ) কে হত্যার দায় নির্দিষ্ট কোন ব্যাক্তি বা দলের উপর পড়বে না। ফলে

রাসুল (দঃ) এর গোত্র চাইলেও একা অন্য সব দলের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারবে না।

জিবরাইল (আঃ) সেই রাতেই রাসুল (দঃ) এর কাছে আসেন ও নিজ বিছানায় না ঘুমাতে বলেন। রাসুল (দঃ) তখন আলী (রাঃ) কে বললেন ওখানে ঘুমাতে– তিনি জানতেন কুরাইশরা তাঁকেই খুন করতে চায় – আলীর (রাঃ) ক্ষতি তারা করবে না। রাসুল (দঃ) যখন ঘরের ভিতরে তখন সব দলের যুবকেরা এসে বাসার সামনে জড়ো হলো।

তাদের সামনে দিয়েই রাসুল (দঃ) যখন বাসা থেকে বের হলেন , তখন আল্লাহ তাদের দেখার শক্তি কেড়ে নেন – ফলে কেউ–ই দেখলো না যে রাসুল (দঃ) বাসা থেকে বেরিয়ে গেলেন। যুবকেরা সারা রাত রাসুল (দঃ) এর বাড়ির সামনে পাহার দিলো। সকালে তারা যখন দেখলো মুহাম্মাদ (দঃ) নয় বরং আলী (রাঃ) বের হলেন বাড়ি থেকে , তখন রাগে অস্থির হলো তারা। বুঝলো যে তাদের খুনের পরিকল্পনা পুরোপুরি ব্যর্থ।(টীকা ৪০)

<u>রাসুল (দঃ) কে বাঁচানোর জন্য পাহাড়ের গুহায় আল্লাহর মুযেজা ---</u>

আলী (রাঃ) যখন রাসুল (দঃ) এর বিছানায় তখন রাসুল (দঃ) ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহচর আবু বকর (রঃ) এর বাসায়। তাঁরা একসাথে মদীনায় রওনা হন।

রাসুল (দঃ) জানতেন মুর্তি উপাসকরা তাঁকে খুঁজবে। তাই মদীনায় যাওয়ার উত্তরের পথ বাদ দিয়ে তিনি বিপরীত দিকের পথ ধরলেন । এটা ছিল ইয়েমেনে যাওয়ার জন্য মক্কার দক্ষিণের পথ। এই পথ ধরে ৬ কিলোমিটার হাঁটার পর তাঁরা সওর পাহাড়ে আসলেন। এটি ছিল খুব উঁচু পাহাড় ও উপরে উঠার জন্য বিপদজনক। রাসুল (দঃ) তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকর (রাঃ) সহ এই পাহাড়ের এক গুহায় তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন । বিভিন্ন সুত্রে বলা হয় , এই গুহার নাম আথহাল --- টীকা ৪১

কুরাইশরা সব রাস্তা বন্ধ করে দিলো ও সশস্ত্র লোকদের নিয়োগ করলো রাসুল (দঃ) কে ধরার জন্য। ঘোড়ায় চড়ে ও পায়ে হেঁটে কাফিররা পায়ের ছাপ খুঁজে খুঁজে রাসুল (দঃ) এর সন্ধান করতে থাকলো। তারা পাহাড়ে ও উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়লো। পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে অনুসন্ধানকারীরা রাসুল (দঃ) যে গুহায় লুকিয়ে ছিলেন , ঠিক সেখানেই হাজির হলো। এমন মুহূর্তে রাসুল (দঃ) তাঁর সম্পুর্ণ বিশ্বাস আল্লাহর উপর রাখলেন । জীবনভর যা ঘটেছে , এখনও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর ইচ্ছায় রাসুল (দঃ) অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন।

মক্কার পৌত্তলিকরা যখন রাসুল (দ:) এর সন্ধানে গুহার মুখে সত্যিই পৌঁছেই গেল , তখন তারা দেখলো সেখানে মাকড়সা জাল বুনেছে ও কবুতর বাসা বানিয়ে ডিম পেড়েছে। তাই তারা ভাবলো এই গুহায় কোন মানুষ ঢুকে নি। কেননা , তাহলে মাকড়সার জাল আর কবুতরের বাসা গুহার মুখে থাকতো না। তারা একেবারে গুহার মুখ থেকে ফিরে গেল।

এই ঘটনা আল্লাহর তরফ থেকে মুযেজা। আল্লাহর ইচ্ছাতেই মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে ও কবুতর বাসা বানায়। গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা রাসুল (দ:) ও তাঁর সাথীর কোন ক্ষতি হলো না। এটা আল্লাহর মুযেজা যে অদৃশ্য শক্তি দিয়ে রাসুল (দ:) কে সাহায্য করা হলো ও তাঁর মনে নিরাপত্তা ও স্বস্তি দান করা হলো। কুরআনে সুরা তওবাতে এর উল্লেখ আছে ---" তোমরা রাসুলকে সাহায্য না করো , আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করেন যখন কাফিররা তাঁকে বাধ্য করে (মক্কা থেকে) চলে যেতে আর তারা দু'জন ছিল গুহাতে । রাসুল তাঁর সাথীকে বলেন , হতাশ হয়ো না ; আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন। তখন আল্লাহ তাঁকে প্রশান্তি দান করলেন ও তাঁকে শক্তিশালী করলেন এমন বাহিনী দিয়ে যাদের তোমরা দেখতে পাও নি। তিনি কাফিরদের কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করেন । অবশ্যই আল্লাহর কথা সবার উপর প্রাধান্য পায় (৯: ৪০)

তাফসীর ইবনে কাসীরে এই মুযেজার ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছে --
"তোমরা রাসুলকে সাহায্য না করো"----- এই আয়াতে আল্লাহ বলেন এতে কিছু যায় আসে না তোমরা রাসুলকে সাহায্য করো নি কেননা আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসুলকে সাহায্য করেন "যখন কাফিররা তাঁকে বাধ্য করে (মক্কা থেকে) চলে যেতে আর তারা দু'জন ছিল গুহাতে"

এই বহিস্কারের ঘটনা হলো মক্কা থেকে রাসুল (দ:) এর মদীনায় হিযরত । পৌত্তলিকরা যখন রাসুল (দ:) কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে , তখন তিনি সাথীসহ মক্কা ত্যাগ করেন। তারা দুজনেই সওর গুহায় তিন রাত লুকিয়ে থাকলেন ।

অসংখ্য শত্রু তাঁদের খোঁজে নিস্ফল ঘোরাফেরা করলো। আবু বকর (রা:) এক সময় ভয় পাচ্ছিলেন যে কাফিররা দেখে ফেলবে ও তাঁদের ক্ষতি করবে।

অবশ্য রাসুল (দঃ) আল্লাহর সাহায্যের নিশ্চিত ছিলেন । তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আল্লাহ অবশ্যই তাঁদের রক্ষা করবেন। তাই তিনি আবু বকর (রাঃ) কে অভয় দেন ।

আনাস থেকে ইমাম আহমেদ বর্ণনা করেন : আবু বকর (রাঃ) বলেন :
আমি রাসুল (দঃ) এর সাথে গুহায় ছিলাম। তখন কাফিরদের দেখতে পেয়ে আমি বললাম , " হে আল্লাহর রাসুল (দঃ); যদি একজনও নিজের পায়ের নীচে তাকায় , তাহলে আমাদেরকে দেখতে পারবে "। রাসুল (দঃ) জবাব দেন ; তুমি এমন দু'জন মানুষ সর্ম্পকে কী ভাবো যাদের সাথে তৃতীয় সাথী হিসাবে আল্লাহতালা আছেন ? বুখারী ও মুসলিমও এই একই হাদীসের উল্লেখ করেন।

সেজন্য আল্লাহ বলেন , " তারপর আল্লাহ প্রশান্তি তাঁর উপর নাযিল করলেন "। আল্লাহ'ই রাসুল (দঃ) কে শান্তি , স্বস্তি ও সমর্থন দান করেন। " এবং তাঁকে শক্তি দান করলেন এমন এক বাহিনী দিয়ে যাদের তুমি দেখো নি" -- এই বাহিনীর অর্থ ফিরিশতারা। " আল্লাহ কাফিরদের কথাকে নীচু করে দিলেন ও আল্লাহর কথা উপরে থাকলো " -- ইবনে আব্বাস বলেন : কাফিরদের কথা হলো আল্লাহর সাথে অংশদারীত্ব ও আল্লাহর কথা হলো ' নেই কোন মাবুদ আল্লাহ ছাড়া ' (টীকা ৪২)।

<u>আল্লাহ যুদ্ধের মধ্যে রাসুল (দঃ) ও বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করলেন :</u>

২৩ বছর ধরে কুরআনের বাণী রাসুল (দঃ) এর কাছে নাজিল হয়। ওহী নাজিলের প্রথম তেরো বছর মুসলমানরা মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে সংখ্যালঘু হিসাবে ছিল ও অনেক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক মুসলমানকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয় , অনেক মুসলমানকে মেরে ফেলা হয়। অনেকের ঘর-বাড়ি-সম্পদ লুট করা হয়। মুসলমানরা সবসময়ই অপমান ও হুমকীর মুখে থাকতো । এসব সত্বেও মুসলমানরা সংঘর্ষের পথকে বেছে নেয় নি - সবসময়ই পৌত্তলিকদের সাথে শান্তি বজায় রাখতে চেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত যখন মুশরিকদের নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে যায় , তখন মুসলমানরা হিযরত করে ইয়াথরিব শহরে (পরে এর নাম হয় মদীনা)।

সেখানে স্থানীয় জনগণ ও ইয়াহুদীদের সাথেথেকে মুসলমানরা নিজেদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। কাফিরদের কাছ থেকে আর কোন হুমকি এলে আল্লাহ মুসলমানদেরকে অনুমতি দেন আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর মোকাবেলা করতে। কাফিররা যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

করতো , তখন আল্লাহ তাঁর রাসুল (দঃ) কে শারীরিক , মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক মুযেজার মাধ্যমে সাহায্য করতেন --- যেন রাসুল (দঃ) রক্ষা পান ও ইসলামের প্রসার ঘটান।

রাসুল (দঃ) ছিলেন সাহসী ও বীর পুরুষ যিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজে অংশ নিতেন ও মুখোমুখি শত্রুর মোকাবেলা করতেন। যদিও তিনি যুদ্ধের ময়দানে সামনের দিকে থাকতেন , তাঁকে কেউ মেরে ফেলতে পারে নি। আল্লাহর তরফের এটা মুযেজা যে তিনি অক্ষত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতেন। আবু জাদান থেকে এই মুযেজার কথা বর্ণনা করেন ইবনে হাম্বাল , আত তাবারানী ও আবু নায়ীম । আমি রাসুল (দঃ) কে দেখলাম । একজন লোককে তাঁর সামনে আনা হলো। রাসুল (দঃ) কে বলা হলো – এই লোক আপনাকে খুন করতে চেয়েছিলো । এ শুনে রাসুল (দঃ) বললেন , তোমরা ভয় পেও না। ভয় পেও না। তোমরাও যদি চাইতে --- আল্লাহ তা হতে দিতেন না। (টীকা ৪৩)

রাসুল (দঃ) যদিও জানতেন যে তিনিই কাফির ও মুনাফিকদের আঘাতের লক্ষবস্ত , তিনি সবসময়ই বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেন। রাসুল (দঃ) জানতেন যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ'ই তাঁকে রক্ষা করবেন। তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন। তিনি আর কাউকে না বরং শুধু আল্লাহকেই ভয় পেতেন।

রাসুল (দঃ) ও বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ সাহায্য করেন এমন একটি স্মরণীয় যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। হিজরতের দ্বিতীয় বছরে পবিত্র রমজান মাসে এই যুদ্ধ হয়। আল্লাহ মনস্তাত্ত্বিক , আধ্যাত্মিক ও শারীরিক মুযেজার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে সাহায্য করেন -- এমন কী তা যুদ্ধ শুরুর আগেই : " যখন তোমরা ছিলে দুর্বল তখন আল্লাহ তোমাদেরকে বদরের যুদ্ধে সাহায্য করেন ; তাই আল্লাহকে ভয় করো যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো " (সুরা ইমরান; ৩: ১২৩)।

দুই পক্ষ যখন মুখোমুখি হয় , তখন দুই দলই একে অন্যের সৈন্য সংখ্যাকে কম দেখে। এই ঘটনা কুরআনে বলা হয়েছে সুরা আনফালে :
"আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নে তাদের সংখ্যা খুবই কম দেখালেন । যদি বেশী সংখ্যায় দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারাতে ও যুদ্ধের ব্যাপারে মতবিরোধ করতে কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে বাঁচালেন। তিনি তোমাদের মনের খবর জানেন। যখন তোমরা মুখোমুখি হলে তখন তোমাদের চোখে তাদেরকে কম দেখালেন আর তাদের চোখেও তোমাদের সংখ্যা কম দেখালেন --- যাতে

আল্লাহ যা ঠিক করে রেখেছেন তাই ঘটে। সব কিছুই আল্লাহর কাছে ফিরে যায় " (সুরা আনফাল ; ৮: ৪৩-৪৪)।

আল্লাহর এই মুযেজার পিছনে গভীর জ্ঞান রয়েছে। মুসলমানরা যখন দেখলো তারা যা ভেবেছিল কাফিরদের সংখ্যা তার থেকে অনেক কম , তখন তা তাদের সাহস বাড়ালো ও মনোবল দৃঢ় করলো।

আবার কাফিররা যখন দেখলো মুসলমানরা সংখ্যায় একেবারেই কম , তখন তারা অসাবধান হয়ে পড়লো আর ভাবলো - সহজ জয়তো হাতের মুঠোয়।

ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন - " সংখ্যায় কম ---" এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী দাসদের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শণ করলেন।

আল্লাহ মুসলমানদের চোখে কাফির বাহিনীকে এত ছোট দেখালেন যা তাদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে উৎসাহী করে।

আবদুলাহ ইবনে মাসুদ বলেন: আলাহ কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা আমাদের চোখে এত কম করে দেখালেন যে আমি পাশের লোককে প্রশ্ন করলাম - ওরা সত্তরজন , তাই না ? সে বললো , না একশ' হবে।

আমরা তখন কুরাইশ বাহিনীর একজন লোককে ধরে জানতে চাইলাম তাদের সংখ্যা। সে বললো - আমরা এক হাজার যোদ্ধা। আলাহ'র ইচ্ছায় মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যেকার বিদ্বেষ যুদ্ধের ময়দানে বেড়ে গেল। একই সাথে একে অন্যের বাহিনীকে ক্ষুদ্র দেখতে পেয়ে যুদ্ধ করতে ভয় পেল না । - টীকা ৪৪ (বর্ণনাকারী আবু ইসহাক আস সাবিল)।

বছরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। শক্তিশালী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগের রাতে ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর দুশ্চিন্তা করা ছিল স্বাভাবিক। এমন ভীতিজনক রাত না ঘুমিয়েই সবাই পার করবে -- এমনটিই ছিল স্বাভাবিক। অথচ দেখা গেল মুসলমান সৈন্যরা শান্তিতে , নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে। ফলে যুদ্ধের দিন সকালে তারা সতেজ ও ধীর-স্থির মনে ঘুম থেকে উঠে। এটাও আলাহ'র তরফের এক মুযেজা :

“ তিনি তোমাদেরকে নিদ্রায় আচ্ছন্ন করলেন , তোমাদেরকে নিরপত্তার অনুভূতি দিলেন....”(সুরা আনফাল; ৮ : ১১)।

এছাড়াও আল্লাহ মুসলমানদের উপর বৃষ্টি ঝরালেন । এর পিছনে গভীর জ্ঞান ছিল যা কুরআনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : “....তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি পাঠালেন তোমাদেরকে পবিত্র করতে ও শয়তানের কু – মন্ত্রণা তোমাদের থেকে দুর করতে ; এবং তোমাদের মনকে সুরক্ষিত ও পা যেন মাটিতে দৃঢ় থাকে সেজন্য। ” (আনফাল : ৮:১১)

হালকা বৃষ্টি মুসলমানদের ক্লান্তি দুর করে তাদেরকে সতেজ করে তোলে। বৃষ্টির পানি মুসলমানরা পান করে ও সে পানিতে ওজু করে পবিত্র হয়। মুসলিম শিবির যেখানে ছিল , ঐ জায়গা ছিল ধুলা– বালিতে ভরা। সেজন্য সৈন্যদের সেখানে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিলো ও পা বালির ভিতরে দেবে যাচ্ছিলো। বৃষ্টির পানিতে ধুলিময় মাটি শক্ত হয়। ফলে মুসলমানদের জন্য হাঁটা –চলা করা সহজ হয় ও “ তাঁদের পা দৃঢ় হয় ’’ । এভাবে যুদ্ধ শুরুর আগেই মুসলমানদের মনোবল খুবই বেড়ে যায় ও মনে আসে।

যুদ্ধ যখন শুরু হলো , তখন রাসুল (দ:) তাঁকে ও মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আল–াহ’র কাছে দোয়া করলেন। আলাহ সাথে সাথেই রাসুল (দ:) এর আবেদনে সাড়া দেন ও অনেক ফিরিশতা পাঠিয়ে দেন মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ও যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য।

“যখন তুমি তোমার প্রভুর কাছে সাহায্য চাইলে ও তিনি সাড়া দিলেন : আমি তোমাকে সাহায্য করবো সারিবদ্ধ হাজার ফিরিশতা দিয়ে । আল্লাহ এটা করেন শুধুমাত্র তোমাকে সুখবর দেয়ার জন্য যাতে তোমার মন শান্তি লাভ করে। সাফল্য আসে শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই । আল্লাহ সব জানেন , সব শক্তির অধিকারী কেবল তিনিই ” (সুরা আনফাল ; ৮: ৯–১০)।

ফিরিশতাদের সাহায্য সম্পর্কে আস সাবুনি তার তফসীরে বলেন : “ আমি তোমাকে সাহায্য করবো সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে ” –– এই আয়াতে আলাহ জানান যে রাসুল (দ:) এর দোয়া তিনি কবুল করেছেন। তফসিরবিদরা বলেন হাদীসে আছে জিবরাইল (আ:) পাঁচশ’ ফিরিশতা নিয়ে মুসলিম বাহিনীর ডানে থেকে যুদ্ধ করেন। মিকাইল (আ:)ও পাঁচশত ফিরিশতা নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। এই ফিরিশতারা সেনাবাহিনীর বামে ছিল।

বদর ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ফিরিশতারা যুদ্ধে অংশ নেন কি না , তা নিশ্চিত বলা যায় না। মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা যেন বেশী মনে হয় , সেজন্য অন্যান্য যুদ্ধে ফিরিশতারা ময়দানে উপস্থিত হতেন কিন্তু যুদ্ধে অংশ নিতেন না।

ওমর নাসুহী বিলমান আরো ব্যাখ্যা করেন : রাসুল (দঃ) এভাবে দোয়া করেন --
" প্রভু। আপনার কথামতো আমাকে বিজয় দান করুন । " এরপরেই তিনি হালকা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন ও তারপর হাসিমুখে জেগে ওঠেন। তিনি পাশে থাকা আবু বকর (রাঃ) কে বলেন : সুখবর আবু বকর। জিবরাইল (আঃ) ও আরো অনেক ফিরিশতা আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে। " এরপর তিনি যুদ্ধের অস্ত্র , ঢাল এসব রেখেই তাবু থেকে বেরিয়ে আসেন। মুসলিম সৈন্যদের অনেকেই চিন্তিত ছিল শত্রুর সংখ্যা নিয়ে। তারা শুনলো আলাহ'র সাহায্য এসেছে ফিরিশতা পাঠানোর মধ্য দিয়ে। জানা যায় যে ,তখন শক্তিশালী এক বায়ু প্রবাহিত হয় ও কেউ-ই কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। জিবরাইল (আঃ) ও আরো অনেক ফিরিশতা আসার এটি একটি চিহ্ন।

এই ফিরিশতারা সাদা ঘোড়ায় বসা ছিল। দেখতে সাদা ও হলুদ রংয়ের মানুষের মত দেখাচ্ছিলো্ এরা সশরীরে বদর যুদ্ধে অংশ নেয়। এই যুদ্ধে প্রথমে এক হাজার , এরপর দুই ও তিন হাজার ফিরিশতা মুসলমানদের সাহায্য করতে আসে। পরে এই সংখ্যা বেড়ে পাঁচ হাজারে হয়। - টীকা ৪৫

ফিরিশতাদের দিয়ে বিশ্বাসীদের সমর্থন দেয়ায় দ্বি-মুখী প্রভাব দেখা যায়। একদিকে এটা মুসলমানদের উপকারে আসে , অন্যদিকে তা শত্রুদের মনে ভয় সৃষ্টি করে। ইবনে কাসির বলেন : আবু হুরায়রা জানায় রাসুল (দঃ) বলেন : শত্রুর মনে ভয় ঢুকিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়। এছাড়া আমাকে দান করা হয়েছে সংক্ষেপিত সুস্পষ্ট বাণী (মুসলিম) -- টীকা ৪৬

বদর যুদ্ধের শুরুতে কাফিররা মুসলিমদের একদম অল্প সংখ্যায় দেখে। অথচ যুদ্ধ শুরুর পরে আসল সংখ্যা থেকেও অনেক বেশী করে সৈন্য তারা দেখতে থাকে

“দুই দলের মোকাবেলায় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে ; এক দল আল্লাহর পথে লড়াই করছিলো , তাদের বিপক্ষে ছিল কাফিররা । মুসলমানদেরকে কাফিররা দ্বিগুণ সংখ্যায় দেখে । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য পাঠিয়ে শক্তিশালী করেন । অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষদের জন্য এতে নির্দেশ আছে ” (সুরা ইমরান ; ৩:১৩)।

মুসলিমদেরকে নিজেদের সংখ্যার চেয়ে কাফিররা দ্বিগুন সংখ্যায় দেখতে পায়। এটা ছিল আল্লাহর মুযেজা। এতে কাফিররা ভয়ে আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এভাবেও আল্লাহ মুসলমানদের সাহায্য ও কাফিরদের অপদস্থ করেন। অন্য যুদ্ধে ফিরিশতা পাঠানো হয় মুসলিম বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোর জন্য , যাতে মুসলিম সৈন্য শত্রুর চোখে সংখ্যা ও শক্তিতে বেশী দেখায়।

হিজরতের অষ্টম বছরে সংঘটিত হুনায়ুন যুদ্ধের কথা কুরআনে বলা হয়েছে --- “আল্লাহ তখন রাসুল ও মুমিনদের প্রশান্তি দান করেন ও এমন বাহিনী পাঠান যাদেরকে তোমরা দেখো নি ; তিনি কাফিরদের শাস্তি দেন ; কাফিরদের প্রতিফল এমনই ” (সুরা তওবা , ৯: ২৬)

রাসুল (দ:) এর সময়ে মুসলমানরা আর একটি মুযেজার অভিজ্ঞতা পায়। তা হলো শত্রুপক্ষ যখন লড়াই শুরু করতো তখন মুসলমানরা ভীত বা দ্বিধাগ্রস্থ হতো না। কুরআনে আমাদের জানায় যে কাফিররা অনেক শক্তিশালী যোদ্ধা সংগ্রহ করতো মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য। সংখ্যায় কম মুসলমানদের উপর নির্যাতন করার চেষ্টা চালাতো শক্তিধর কাফির বাহিনী। এই অবস্থায় মুসলমানরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতো ও তাঁর উপরেই পুর্ণ আস্থা রাখতো।

আল্লাহর সমর্থন পাওয়ায় ও তাঁর হেফাযতে থাকায় মুসলমানরা নানাভাবে রহমতপ্রাপ্ত হতো ও নিরাপদে ফিরে আসতো। এর একটি উদাহরণ --- আল্লাহর আরেকটি মুযেজা হলো যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা সাহসী ও দৃঢ় পদ থাকলে অনেক বেশী শত্রুর বিরুদ্ধেও তারা জয়ী হতো।

“ হে নবী ; মুমিনদের লড়াই করতে উৎসাহিত করো । যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন দৃঢ়পদ থাকো , তবে দুইশ’ জনকে হারাতে পারবে ; তোমাদের একশ’ জন এক হাজার কাফিরদের হারাতে পারবে -- কেননা ওরা এমন এক জাতি যাদের বোধ শক্তি নেই।

আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন -- তিনি তোমাদের দুর্বলতা জানেন। তোমরা যদি অবিচলিত থাকো , তবে তোমাদের একশ' জন বিজয়ী হবে দুই শ' জনের বিপক্ষে ; যদি এক হাজার মুসলমান থাকে তবে আল্লাহর ইচ্ছায় দুই হাজারজনকে হারাতে পারবে। যারা দৃঢ় আস্থার পরিচয় দেয় , আল্লাহ তাদের সাথে আছেন "
(সুরা আনফাল ; ৮ : ৬৫-৬৬)।

আল্লাহ কেন মুসলমানদের এত বেশী করে সাহায্য করেছেন , সে সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যায় সার-সংক্ষেপ করে বলা হয়েছে -- মুসলমানদের ছিল তাকওয়া (আল্লাহ ভীরুতা) ও সবর (ধৈর্য্য)।

আল্লাহ কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে নিতে মানা করলেন ও কারনও জানিয়ে দিলেন। তিনি কথা দিলেন যে বিশ্বাসীরা যতদিন পর্যন্ত ধৈর্য ও তাকওয়ার পরিচয় দেবে, আল্লাহ ততদিন কাফিরদের সব ষড়যন্ত্র ও ফাঁদ নিস্ফল করে দেবেন। আল্লাহ দুইটি উদাহরণ দেন যখন তিনি বিশ্বাসী

দাসদের অভিভাবক হিসাবে আবিভূত হন। একটি হলো উহুদ ও অন্যটি হলো বদরের যুদ্ধ। এই দুই যুদ্ধের দিনে বিশ্বাসীদের ধৈর্য ও তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র নসাৎ করেন।

এই দুই যুদ্ধ বড় প্রমাণ কিভাবে আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক হিসাবে শত্রুদের সব ষড়যন্ত্র ও শয়তানী চক্রান্ত ব্যর্থ করেন। বিশ্বাসীদের সবর ও আল্লাহ ভীরুতার কথা কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে --- " যদি তোমরা দৃঢ়পদ থাকো ও আল্লাহকে ভয় করো , তাহলে কাফিরদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না " । (টীকা ৪৭)

ধৈর্য ও তাকওয়ার পুরষ্কার হিসাবে মুসলমানরা মানসিক শান্তি লাভ করে ও আধ্যাত্মিক এবং জাগতিকভাবে উপকৃত হয়। কুরআনে আল্লাহ মুসলমানদের অসাধারন মনোভাব ও অলৌকিক সাহায্যের কথা বর্ণনা করেন।

“ওদেরকে লোকে বলেছিল : তোমাদেরকে শত্রু ঘেরাও করছে , তাই তাদেরকে ভয় করো ; কিন্তু এতে বিশ্বাসীদের ঈমান আরো বেড়ে যায় ও তারা বলে : আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও তিনিই সেরা অভিভাবক। তাই তারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহসহ ফিরে আসে ও কোন অশুভ কিছু তাদের স্পর্শ করে নি । তারা আল্লাহর সন্তুস্টি কামনা করেছিল । নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম ” (সুরা ইমরান ; ৩: ১৭৩–১৭৪)।

কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সফল করার জন্য -- তবুও তারা ব্যর্থ হয়। এর কারণ রাসুল (দ:) একজন রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি আল্লাহর হেফাযতে ছিলেন। আল্লাহ বলেন , অলৌকিকভাবেই রাসুল (দ:) রক্ষা
পান : “...তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তারা যা করে তার সব কিছুই আল্লাহর আয়ত্তে ” (সুরা ইমরান; ৩: ১২০)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ কথা দেন কোন মানুষ ভবিষ্যতে রাসুল (দ:) কে শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

“ আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা না থাকলে তাদের এক দল তোমাকে নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত করতো ; কিন্তু তারা কেবল নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করে ও তোমার কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে না। আল্লাহ তোমাকে আসমানী কিতাব ও জ্ঞান দান করেছেন ও শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না। নিশ্চয়ই তোমার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে ” (সুরা নিসা ;৪ : ১১৩)

“ এরা এমন মানুষ যারা মিথ্যা শুনতে ভালবাসে ও হারাম খায় । যদি তারা তোমার কাছে আসে , তাহলে হয় ন্যায়বিচার করো অথবা ওদেরকে উপেক্ষা করো। তুমি যদি তাদেরকে উপেক্ষা করো , ওরা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না । কিন্তু যদি তুমি মীমাংসা করো

, তবে ন্যায়- বিচার করবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন যারা ন্যায় কাজ করে " (সুরা মায়েদাহ ; ৫ : ৪২)।

৯। অদৃশ্যের জ্ঞান রাসুল (দঃ) কে দেয়া হয় -

একমাত্র আল্লাহরই আছে অদৃশ্যের পুরো জ্ঞান। অতীতের খুঁটিনাটি তথ্য থেকে শুরু করে বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহ সবই জানেন। তিনিই সময় সৃষ্টি করেছেন ও মানুষকে এ সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন। আল্লাহ সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। আল্লাহ জানেন মহাবিশ্বের কোথায় কী ঘটছে ও তিনিই এর নিয়ন্ত্রণকারী । তিনি সব কিছুর রহস্য জানেন। তিনি তাঁর নির্বাচিত রাসুলদের (দঃ) এই জ্ঞানের কিছুটা দান করেন-- ততটুকুই যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।
" আল্লাহ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন --- এই জ্ঞান তিনি আর কাউকে দেন না তাঁর রাসুল ছাড়া যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট ; সে সময় তিনি পাহারা বসান রাসুলের সামনে ও পিছনে (সুরা জিন্ন ; ৭২: ২৬-২৭)।

কুরআনে বলা আছে হযরত ইউসুফ , ঈসা ও মুহাম্মাদ (দঃ) ছিলেন এমন নির্বাচিত রাসুলদের অন্যতম যাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান কিছু দান করা হয়েছিল। আল্লাহ রাসুল (দঃ) এর কাছে বেশ কিছু রহস্য প্রকাশ করেন। রাসুল (দঃ) অতীতের এমন কিছু ঘটনার কথা জানতেন যা জানা অন্য কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ভবিষ্যতের কিছু ঘটনা সম্পর্কেও জানতেন : " এ হচ্ছে অদৃশ্যের জ্ঞান যা আমি তোমাকে জানালাম" (সুরা ইউসুফ ; ১২: ১০২)।

অদৃশ্যের জ্ঞান লাভ রাসুল (দঃ) এর নিজের ক্ষমতার অধীনে ছিল না। এটা একটা মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। রাসুল (দঃ) অদৃশ্য সম্পর্কে ততটুকুই জানতেন যা আল্লাহ নিজ ইচ্ছা মতো তাঁকে জানান। রাসুল (দঃ) মাঝে মাঝে মানুষকে এমন কিছু বলতেন যা একমাত্র আল্লাহর ওহী লাভ ছাড়া অন্যভাবে জানা সম্ভব ছিল না। এটা একটা প্রমাণ যে তিনি আসলেই আল্লাহর রাসুল (দঃ)।

অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অনেক কিছু জানার পরেও রাসুল (দঃ) ছিলেন বিনীত ও অনুগত : " বলো : আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমার নিজের ভাল- মন্দের উপর কোন ক্ষমতা আমার নেই । আমার নিজের যদি অদৃশ্যের জ্ঞান থাকতো , তাহলে তো আমি প্রচুর কল্যাণ লাভ করতাম

আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতো না । আমি কেবল একজন সতর্ককারী আর বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদদাতা" (সুরা আরাফ; ৭ : ১৮৮)।

এই অনন্য জ্ঞান রাসুল (দ:) লাভ করেন কুরআন ও অন্যান্য ঐশ্বরিক সুত্র থেকে। কিছু জ্ঞান ছিল অল্প দিনের মধ্যে যা ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে যেমন যুদ্ধ জয়ের ভবিষ্যত বাণী। কিছু জ্ঞান ছিল এমন ঘটনা সম্পর্কে যা ঘটবে রাসুল (দ:) এর মৃত্যুর কয়েক বছর পর যেমন কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়া ।

বিশেষ কিছু জ্ঞানও রাসুল (দ:) এর ছিল যেমন কিয়ামতের পুর্ব লক্ষণ --যেগুলি ওহী আসার ১৪০০ বছর পরেও এখনো সবগুলি ঘটে নি -- আরো পরে ঘটবে। আল বুখারী , মুসলিম , আবু দাউদ , আর তিরমিযী , আল নাসাই , ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা একমত যে হাদীসে রাসুল (দ:) এর কাহিনীতে অদৃশ্যের জ্ঞান বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসুল (দ:) এমন সব ঘটনা জানতেন যা অন্য কেউ জানতো না –

রাসুল (দ:) এমন সব ঘটন ও তথ্য সম্পর্কে জানতেন যা অন্য কারো পক্ষে জানা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। এটা ঘটে কেননা আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:) কে সে সব গোপন কথা জানিয়ে দিতেন।

কুরআনে আল্লাহ এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। রাসুল (দ:) একটি গোপন কথা তাঁর এক স্ত্রীকে বলে কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু রাসুল (দ:) এর স্ত্রী যে কথা অন্য একজনের কাছে ফাঁস করে দেন । আল্লাহ এটি রাসুল (দ:) কে জানান। রাসুল (দ:) যখন তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে তিনি জেনে ফেলেছেন ঘটনাটা। তখন স্ত্রী অবাক হয়ে জানতে চান রাসুল (দ:) কিভাবে ঘটনাটি জানলেন। রাসুল (দ:) এর উত্তর ছিল -- আল্লাহ'ই জানিয়েছেন আমাকে।

কুরআনের সুরা তাহরিমে এর উল্লেখ আছে :

" নবী তাঁর এক স্ত্রীকে গোপন কথা বলার পর স্ত্রী অন্যকে বলে দিল , আল্লাহ তা নবীকে জানান। নবী এ ব্যপারে স্ত্রীকে কিছু বললো আর কিছু অংশ বললো না। স্ত্রী জানতে চাইলো , আপনাকে কে এসব বলেছে ? নবীর উত্তর , যিনি সব জানেন ও সব বিষয়ে অবগত তিনিই আমাকে এটা বলেছেন " (তাহরিম ; ৬৬: ৩) ।

আরেকটি ঘটনা --- বদর যুদ্ধের পর রাসুল (দঃ) এর চাচা আব্বাসকে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে রাসুল (দঃ) এর সামনে আনা হয়। চাচা ছিলেন কাফির। তাকে রাসুল (দঃ) প্রশ্ন করেন - মুসলিম বাহিনীকে তিনি কী মুক্তিপণ দেবেন ? চাচা জানায় তার কাছে কোন অর্থ নেই।

রাসুল (দঃ) তখন জানতে চান মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য রওনা হওয়ার আগে যে অর্থ তিনি স্ত্রী উম্মে আল ফজলকে দিয়ে এসেছেন সেটা কী হলো ? আব্বাস অবাক হয়ে জানতে চান কিভাবে রাসুল (দঃ) এই অর্থের কথা জানলেন ? কেননা , তিনি রাতের বেলা গোপনে স্ত্রীকে তা দিয়েছেন -- অন্য কেউ এ সম্পর্কে জানে না।

রাসুল (দঃ) বলেন যে আল্লাহ তাঁকে এই কথা জানিয়েছেন। আব্বাস তখন বুঝতে পারে যে মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যিই আল্লাহর রাসুল (দঃ)। তিনি তখনই ইসলাম কবুল করেন (মুসনাদ আহমেদ , মুসলিম , তফসীর ইবনে কাসীর) ।

আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাজিল করে কিছু মানুষের মনের গোপন কথা ও গোপন আচার-আচরণ সম্পর্কে জানান।

আল্লাহ মুনাফিকদের মিথ্যা সম্পর্কে ও মুখের কথায় আড়ালে তাদের সত্যিকারের মনোভাব কী --- যা কিছুই প্রকাশ করেন। এতে
রাসুল (দঃ) বুঝতে পারেন সত্যিকারের মুসলমান কারা ও কারা মুনাফিক। ফলে কোন মানুষকে বিশ্বাস করা যায় আর কাকে যায় না , তা রাসুল (দঃ) সহজেই বুঝতে পারেন।

রাসুল (দঃ) ছিলেন মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যবস্ত্ত , তাই আল্লাহর তরফ থেকে এটা ছিল সত্যিই বড় রকমের সাহায্য ও হেফাযত।

আল্লাহ রাসুল (দঃ) কে আরো জানান তিনি কী বলবেন , কী করবেন :

“ তখন তিনি দু:খের পর তোমাদের মনে স্বস্তি দিলেন , তোমাদের মধ্যে একদল শান্তি তে ঘুমালে , অন্য দল অনর্থক দু:চিন্তা ও আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা চিন্তা করছিলো --যা ছিল মুর্খতার যুগের চিন্তা । তারা বলছিলো , আমাদের কি কোন অধিকার নেই এ ব্যপারে ?

বল : সব বিষয় কেবল আল্লাহর এখতিয়ারে । তারা তোমার কাছে প্রকাশ করে নি আর নিজেদের মনে কিছু কথা গোপন রেখেছিল । তারা বলে : আমাদের যদি কোন অধিকার থাকতো , তাহলে কেউ এখানে এসে মারা যেত না। বলো : ‘ তোমরা যদি তোমাদের ঘরের ভিতরেও থাকতে , যেখানে যার মারা যাওয়ার কথা সে সেখানেই হাজির হতো। ’

তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন , পরিশুধ্ব করেন । তোমাদের মনের গোপন খবর আল্লাহ জানেন ” (ইমরান ; ৩: ১৫৪)

“ তারা কেবল মুখে বলে ‘ আমরা অনুগত ’ অথচ তোমার থেকে দুরে গিয়ে তাদের একদল মুখে যা বলে তার বিপরীত ষড়যন্ত্র করলো সারা রাত ধরে ; আল্লাহ তাদের রাতের ষড়যন্ত্র লিখে রেখেছেন । তাদের যা খুশী করতে দাও আর আল্লাহতেই কেবল বিশ্বাস রাখো । অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ’ই যথেষ্ট (নিসা ; ৪: ৮১)।

“ যে আরবেরা পিছনে রয়ে গিয়েছিল , তারা তোমাকে বলবে : ‘ সম্পদ ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল ; তাই আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। ’ তারা মুখে যা বলে মনে তা বিশ্বাস করে না। বলো : ‘ আল্লাহ যদি তোমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে চান , তাহলে কার ক্ষমতা আছে আল্লাহকে আটকাবার ? ’ তোমরা যা করো , আল্লাহ তা সব জানেন (সুরা ফাতহ; ৪৮ : ১১)।

“ কুফরীর বশে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা তাদের স্বার্থে মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য যারা মসজিদ বানিয়েছে , তারা শপথ করবে : ‘ আমরা শুধু কল্যাণ চাই। ’ আল্লাহ সাক্ষী --এরা আসলেই মিথ্যাবাদী। আপনি কখনোই ঐ মসজিদে নামাজ পড়বেন না ।

তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত , সেই মসজিদই আপনার নামাজ পড়ার উপযুক্ত জায়গা। সেখানে এমন মানুষ আছে যারা পবিত্র হতে ভালবাসে । যারা পবিত্র আল্লাহ তাদের ভালবাসেন ”
(তওবা ; ৯: ১০৭-১০৮)।

মানুষ জানতে চাওয়ার আগেই রাসুল (দঃ) উত্তর দিতেন :-

হাদীসে আছে , মানুষ প্রশ্ন করার আগেই রাসুল (দঃ) উত্তর দিয়ে দিতেন। তিনি জানতেন কে তাঁর বাসায় আসবে , কেউ ঘরে ঢুকার আগেই তিনি বলে দিতেন সে সম্পর্কে। কারো কেন দেরী হলো সেটাও তিনি
জানতেন । (টীকা ৪৮)

হাদীসে এ ধরণের বহু মুযেজার কথা আছে।

আবু সুফিয়ান ইবনে আল হারীম মনে মনে ভাবছিলো এমন প্রশ্নের উত্তর রাসুল (দঃ) একবার তাকে দেন। মসজিদে এক পাশে বসা ছিল আবু সুফিয়ান । রাসুল (দঃ) ঘর থেকে বের হলেন। তাঁকে দেখে আবু সুফিয়ান নিজ মনে বললো : "আমার অবাক লাগে ভাবতে সে কী করে জয়ী হলো ? " রাসুল (দঃ) তার কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন , " আমি তোমাদেরকে হারিয়েছি আল্লাহর সাহায্যে "। আবু সুফিয়ান বললো , আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল (দঃ)। (ইবনে আল হারিথ , ইবনে হাজর আল আসকালানী , আল মাতালিব আল আনিয়াহ)।

ওয়াবিসাহ ইবনে মাসুদ সম্পর্কে একটি হাদীস আছে। এতে বলা হয়েছে যে প্রশ্নের কথা সে ভেবে এসেছিল , তা জানতে চাওয়ার আগেই রাসুল (দঃ) উত্তর দিয়ে দেন। ওয়াবিসাহ বলে , " আমি রাসুল (দঃ) এর কাছে গেলাম । তিনি বললেন : তুমি এসেছো বির (নরৎৎ) সম্পর্কে জানতে ? আমি বললাম : হ্যাঁ। রাসুল (দঃ) বললেন , তোমার মনকে প্রশ্ন করো উত্তরের জন্য। বির হচ্ছে ধর্মের প্রতি অনুরাগের সেই অবস্থা যাতে একজনের মনে শান্তি থাকে। এর বিপরীতে ইথম বা ধর্মহীনতায় মানুষের দেহ-মন অশান্ত থাকে। মনে সবসময় ইতস্তত: ভাব থাকে সঠিক সিদ্ধান্তের বিষয়ে। মানুষ যদিও তাকে বলে কোন বিষয়ে যে এটা বৈধ , তার মন তা গ্রহণ করতে পারে না। (এই সহীহ হাদীস ইসনাদসহ বর্ণনা করেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও আদ দারিমী)।

রাসুল (দঃ) যে মানুষের মনের কথা ও ইচ্ছার কথা জানতে পারতেন তার আরেকটি উদাহরণ হলো আবুদ দারদার মুসলমান হওয়ার ঘটনা। সে ছিল মুর্তি পুজারী। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ ও আবু সালামাহ গিয়ে একদিন সেই মুর্তি ভেঙ্গে ফেললো। আবুদ দারদা এসে তা

দেখে ভাঙ্গা মুর্তিকে না বলে পারলো না , “তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারলে না কেন ? ” পরে সে রাসুল (দঃ) এর কাছে যায়। ইবনে রাওয়াহাহ দুর থেকে তাকে দেখে বললো – আবুদ দারদা নিশ্চয়ই আমাদের খোঁজ করার জন্য আসছে ” ।

আল্লাহর রাসুল (দঃ) বললেন – না। সে আসছে মুসলমান হওয়ার জন্য। আমার প্রভু কথা দিয়েছেন আবুদ দারদা মুসলমান হবে । (টীকা ৪৯)

রাসুল (দঃ) নিজের মৃত্যুর কথা আগেই সাহাবীদের জানিয়ে রেখেছিলেন –

রাসুল (দঃ) এর একটি মুযেজা যা আল্লাহ তাঁকে দান করেন তাহলো উনি নিজের ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবীর (রঃ) মৃত্যুর কথা আগে থেকেই জানতেন। হাদীসে আছে রাসুল (দঃ) বলেন ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের আগে তিনিই সবার আগে মারা যাবেন।

আল্লাহর রাসুল (দঃ) আমাদের দিকে তাকালেন : তোমরা মনে করো আমি তোমাদের সবার পরে মারা যাবো ; সাবধান ; আমি তোমাদের সবার আগে মারা যাবো। আমার মৃত্যুর পর তোমরা মারা যাবো।-- টীকা ৫০

উকাবাহ ইবনে আমীর বলেন : রাসুল (দঃ) বের হয়ে আসলেন ও উহুদ যুদ্ধের শহীদদের জানাযা পড়ালেন। এরপর তিনি মিম্বরে উঠলেন ও বললেন : আমি তোমাদের আগে যাবো ও তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকবো। আল্লাহর শপথ – আমি এই মুহূর্তে আমার কবর দেখতে পাচ্ছি ।

দুনিয়ার সম্পদ ভান্ডারের চাবি আমাকে দান করা হয়েছে --- আল্লাহর শপথ -- আমি এই ভয় পাই না যে আমার মৃত্যুর পরে তোমরা পৌত্তলিক হবে। কিন্তু আমার ভয় তোমরা সম্পদের মোহে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করবে। (বুখারী) । আবু মুওয়াহিবাহ বলেন – আল্লাহর রাসুল (দঃ) মাঝরাতে আমাকে ডাকলেন , বললেন – বাকি কবরবাসীদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে আমাকে বলা হয়েছে। তুমি আমার সাথে আসো ” ।

আমি রাসুল (দঃ) এর সাথে গেলাম । তিনি কবরস্থানে গিয়ে দোয়া করলেন – হে কবরবাসী , তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক্ । তোমাদের কবরে জীবন এই দুনিয়ার মানুষের জীবনের চেয়ে যেন শান্তিময় হয়। দু:খ – কষ্ট অন্ধকার রাত্রির মতো একের পর এক আসছে। একটি অন্যটির থেকে বেশী খারাপ। ”

এরপর রাসুল (দঃ) আমার কাছে সরে এসে বললেন : আবু মুওয়াহিবাহ; আমাকে জগত সম্পদের চাবি ও দীর্ঘ জীবন অথবা আমার প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ ও বাগানের কথা বলা হয়েছে । আমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ ও বাগান বেছে নিয়েছি । (আত – তাবারী , আহমেদ , ইবনে সাদ , আল বাগহাউই ও ইবনে মানদাহী)। রাসুল (দঃ) তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছিলেন । এমন কী , কোনদিন মারা যাবেন , কোন শহর থেকে তিনি এই দুনিয়া ছেড়ে যাবেন ---- সবই বলে যান --- " আমি সোমবারে জন্মেছি ; ওহী আসে সোমবারে ; আমি সোমবারে হিযরত করি ও সোমবারেই আমি মারা যাবো " । (টীকা ৫১)

ইবনে আব্বাস বলেন – রাসুল (দঃ) জন্মেছেন এক সোমবার। তিনি রাসুল (দঃ) রাসুল (দঃ) হন এক সোমবারে। তিনি মক্কা থেকে হিযরত করেন এক সোমবারে ও মদীনায় ঢুকেন এক সোমবারে। মক্কা এক সোমবারে ইসলামের জন্য খুলে যায় ও রাসুল (দঃ) মারা যান এক সোমবারে (ইবনে হাম্বলে ও আল বায়হাকী) (টীকা ৫২)
যে শহরে আমি হিযরত করেছি ও যেখানে আমি মারা যাবো -- যেখানে মৃত্যুর পর আমার কবর হবে -- তাহলো মদীনা । (টীকা ৫৩)

মদীনায় আমি হিযরত করি , মদীনায় আমি মারা যাবো ও সেখান থেকে উঠবো -- টীকা ৫৪

<u>রাসুল (দঃ) কয়েকজন সাহাবীর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করেন–</u>

আল্লাহর তরফের মুযেজা হিসাবে রাসুল (দঃ) যেমন নিজ মৃত্যুর কথা আগেই বলেন , তেমনি সাহাবীদের মৃত্যুর অনেক আগেই কয়েকজনের মৃত্যুর কথা বলেন। হাদীসে এ ধরণের বহু বর্ণনা আছে। রাসুল (দঃ) কয়েকজন সাহাবী শহীদ হবেন ও কোথায় তারা যাবেন সেটাও বলেন।

উমর (রাঃ) এর মৃত্যুর ভবিষ্যত বাণী :

আনিস বিন মালিক বলেন : রাসুল (দঃ) একবার উহুদ পাহাড়ে যান আবু বকর , উমর ও উসমানকে নিয়ে। পাহাড় তখন নড়ে উঠে। রাসুল (দঃ) পাহাড়কে বলেন : " থেমে যাও। তোমার উপরে আছেন একজন রাসুল (দঃ) , একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ। (বুখারী)।

উসমান (রাঃ) এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণী–

আনাস থেকে ইবনে আদি ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন :রাসুল (দঃ) বলেন – উসমান ; আমি যখন থাকবো না , তখন তুমি খলিফার দায়িত্ব পাবে। মুনাফিকরা চাইবে তুমি খলিফা হতে রাজী হবে না। তুমি খলিফা হতে অস্বীকার করবে না , তবে সেদিন রোজা রাখবে । তাহলে আমার সাথে রোজা ভাঙ্গাতে পারবে -- (গ্রন্থ : তারিক দিমাস্ক)।

যায়েদ ইবনে আকরাম বলেন : রাসুল (দঃ) আমাকে বললেন , "আবু বকরের (রাঃ) কাছে যাও। তুমি দেখবে সে ঘরের ভিতর কাপড় পেঁচিয়ে শুয়ে আছে; পা উপরের দিকে মেলানো। তাঁকে বেহেশতের সুখবর দাও। এরপর পাহাড়ের উপরে যাও যতক্ষণ না উমরকে (রাঃ) পাও। দুর থেকে আবছাভাবে দেখবে গাধার পিঠে দীর্ঘদেহী উমর (রাঃ) কে । তাঁকে বেহেশতের সুখবর দাও। এরপর যাবে ওসমান (রাঃ) এর কাছে। তাঁকে তুমি দেখবে বাজারে মাল কেনা–বেঁচা করছে। তাঁকে মর্মান্তিক এক অগ্নি – পরীক্ষার পর বেহেশত লাভের সুখবর দাও। "

আমি তাঁদের কাছে গেলাম। রাসুল (দঃ) যেভাবে বলেছিলেন , ঠিক সেভাবেই তাঁদেরকে পেলাম ও সুখবর জানালাম। { যায়েদ থেকে এটি বর্ণনা করেন আত তাবারানী (দালাইল আন নুবুওয়াহ ও আদ – দাহাবী সিয়ারে) }।

রাসুল (দঃ) বলেন – ওসমান আমার পাশ দিয়ে গেল। আমার সাথে যে ফিরিশতারা ছিল , তাদের একজন বললো : এ একজন শহীদ। এর লোকই একে খুন করবে। আমরা ওর জন্য দুঃখিত ।

{ যায়েদ ইবনে সাবিত থেকে এটি উল্লেখ করেন আত তাবারানী তাঁর আল কাবীর গ্রন্থে) ।

রাসুল (দঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে এর শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণী করেন :–

রাসুল (দ:) আলী (রা:)কে বলেন : মানুষের মধ্যে সে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে তোমাকে এখানে আঘাত করবে – রাসুল (দ:) ইশারা করলেন (আলীর কপালের দিকে) – যতক্ষণ না রক্তে ডুবে যায় (ইশারা করলেন দাড়ির দিকে) ।

এই হাদীস আমর ইবনে ইয়াসির থেকে আবু নায়ীম বর্ণনা করেন ও আল হাকিম একে বিশুদ্ধ বলেছেন। এই হাদীসের উল্লেখ আছে আহমেদের মুসনাদ , আন – নাসাই এর সুনান আল কুবরা , আবু নায়ীম এর দালাইন আন নুবুওয়াহ ও আল হাকীম গ্রন্থে)।

আরেকটি হাদীসে বলা আছে--- রাসুল (দ:) আলী (রা:) কে বলেন : তুমি নেতা ও খলিফা হবে। সত্যিই এটি (দাড়ি) রক্তে লাল হবে (অর্থাৎ কপাল ও মাথার ক্ষতস্থান থেকে বের হওয়া রক্ত)।

এই হাদীস যাবির ইবনে সামুরাহ থেকে বর্ণনা করেন আত তাবারানী ও আবু নায়ীম। এটি তাবারানীর আল কাবীর ও আল আওসাত গ্রন্থে আছে। আনাস বলেন : অসুস্থ আলী (রা:) কে দেখতে আমি রাসুল (দ:) এর সাথে গেলাম। আবু বকর (রা:) ও উমর (রা:) ও সেই সময় আলীকে দেখতে আসেন। একজন অন্যজনকে বলেন : আমার মনে হয় না আলী বাঁচবে। শুনে রাসুল (দ:) বললেন : সত্য হলো এই , আলী তো শহীদ হবে (বর্ণনাকারী আল হাকিম)।

হুসেইন (আ:) এর ধর্মযুদ্ধে নিহত হওয়ার ভবিষ্যত বাণী রাসুল (দ:) করে যান :–

উম্মে সালামাহ থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেন ইবনে রাহওয়াইহ , আল রায়হাকী ও আবু নায়ীম।

রাসুল (দ:) একদিন শুয়ে পড়ার পর জেগে উঠলেন। মুঠো ভর্তি করে হাতে মাটি নিয়ে এদিক– ওদিক ছড়িয়ে দিলেন। আমি জানতে চাইলাম : হে আল্লাহর রাসুল (দ:) ; এই মাটি কী ? তিনি বললেন : " জিবরাইল (আ:) জানালেন এ (অর্থাৎ হুসেইন ইরাকের মাটিতে নিহত হবে ও এটা হচ্ছে ওর শেষ বিশ্রামস্থল । "

(এই হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে আবি আসিমের আল আহাদ ওয়া আল মাতহানি , আত তাবারানীর আল কাবীর ও আল হাকীমে।

আনাস ইবনে আল হারীম থেকে নীচের হাদীসটি বর্ণনা করেন ইবনে আস সাকান , আল বাগহাওয়ী ও আবু নায়ীম।

রাসুল (দ:) বললেন : সত্যিই আমার এই ছেলে -- অর্থাৎ হুসেইন (আ:) কারবালায় খুন হবে। তোমাদের মধ্যে যারা সে সময় বেঁচে থাকবে। তারা ওকে সাহায্য করো ; এ কারণে আনাস ইবনে আল হারীস কারবালায় যান ও হুসেইন (আ:) এর সাথে নিহত হন। (সুহাইম থেকে বর্ণনা করেন আনাস ইবনে মালিক ; এই হাদীসের বর্ণনা আছে আবু নায়ীমের দালাইল গ্রন্থে)।

উমর , উসমান , আলী ও হুসেইন (আ:) সম্পর্কে রাসুল (দ:) এর এসব ভবিষ্যত বাণী একের পর এক সত্য প্রমাণিত হয়। রাসুল (দ:) এর মৃত্যুর পর অনেক বিশ্বাসী মুসলমান যারা ইসলামে প্রচারের গুরু দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়েছিলেন তারা শহীদ হন।

কুরআনের বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস নির্দিষ্ট সেনাবাহিনীর বিশেষ কিছু এলাকায় বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। এসব ভবিষ্যত বাণী করা হয় ঘটনা ঘটার অনেক আগে।

বাইযেনটাইনের জয় :-

কুরআনে সুরা রুমের শুরুতে একটি ভবিষ্যত বাণী আছে। এই আয়াতে আল্লাহ বলেন যে , রোমক বা বাইযেনটাইন সম্রাট যুদ্ধে পারসিয়ানদের বিরুদ্ধে খুব তাড়াতাড়ি জয়ী হবে :

"আলিফ - লাম - মীম ; রোমানরা হেরে গিয়েছে কাছের এলাকাতে কিন্তু এই পরাজয়ের পর তারা অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জয়ী হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাই আল্লাহর এখতিয়ারে। সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে " (সুরা রুম ; ৩০: ১-৪)।

(অনুবাদকের সংযোজন : কুরআনে ব্যবহৃত আদনাল আরদ শব্দ দুইটির অন্য একটি অর্থ হলো সবচেয়ে নীচু ভূমি। অবাক করা ব্যপার হলো যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল অর্থাৎ সমুদ্র পৃষ্ঠের ৩৯৫ মিটার নীচে ডেড সী এলাকায় (সিরিয়া , ফিলিস্তিন ও জর্ডান এর আন্ত:সংযোগ এলাকায়) , তা সত্যিই পৃথিবীর সবচেয়ে নীচু এলাকা। এই তথ্য সে যুগে কোন মানুষের পক্ষে জানা ছিল অসম্ভব।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সাম্প্রতিক সময়েই কেবল এই তথ্য জানা গিয়েছে। আল্লাহ আজ থেকে হাজারো বছর আগে তাঁর উম্মী রাসুলের মুখ থেকে এমন আয়াত বিশ্ববাসীকে

শোনালেন যাকে কেবল মুযেজা হিসাবেই বলা যেতে পারে। এ নিয়ে আরো জানতে পড়ুন হারুণ ইয়াহিয়ার পবিত্র কুরআনের মুযেজা।

যদি কেউ মনে করেন যে , না , সবচেয়ে নীচু অর্থে নয় বরং কাছে অর্থেই আদনাল আরদ এর প্রয়োগ হয়েছে তবুও এই আয়াতে কিছু চমৎকার মুযেজা দেখি আমরা)।

অল্প কয়েক বছর বলতে এই আয়াতে তিন থেকে নয় বছর বোঝানো হয়েছে। ৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে জরোস্ট্রান পারসিয়ানরা খৃস্টান বাইযেনটাইনদের হারিয়ে দেয় এন্টিয়কে এবং বিজয়ী হয় দামাস্ক , সিলিযিয়া , টারসাস , আরমেনিয়া ও জেরুজালেমে।

বিশেষ করে ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে জেরুজালেমের পতন ও হোলি সেপলকার গীর্জা (যেখানে যীশু খ্রীষ্টকে কবর দেয়া হয় বলে খৃস্টানদের বিশ্বাস)-- সেই পুণ্য সমাধি ধ্বংস খুবই বড় আঘাত ছিল। - (টীকা ৫৫)

রোমানদের বিজয়ের যে ভবিষ্যত বাণী কুরআনে করা হয় তা সাত বছর পর ৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সত্য হয়। ঐ সময় রোমানরা চারিদিক থেকে নানা ধরণের হুমকি মোকাবেলা করছিল। শুধু যে পারসিকদের তরফ থেকে হুমকী ছিল তা নয় -- অন্যান্য শত্রুরা ছিল আভার , স্লাভস ও লোমবার্ডস। আভাররা চলে এসেছিল কনস্ট্যান্টিনোপলের সীমানায়।

সেনাবাহিনীর খরচ মেটানোর জন্য বাইযেনটাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস গীর্জায় রাখা বিভিন্ন সোনা , রুপার অলংকার গলিয়ে মুদ্রা বানান। শুধু এতে সন্তুস্ট না থেকে তিনি ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মুর্তিও গলিয়ে মুদ্রা বানান। রোমক সম্রাটের বিরুদ্ধে অনেক গভর্ণর বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও একসময় মনে হতে থাকে সাম্রাজ্য ছিন্ন- ভিন্ন হয়ে পড়বে। অবস্থা এতই ভয়াবহ ছিল যে এটাই ধরে নেয়া হয়েছিল বাইযেনটাইন সাম্রাজের পতন হবেই। আরবের পৌত্তলিকরা নিশ্চিত ছিল রোমানদের ব্যপারে কুরআনের ভবিষ্যত বাণী কখনোই সত্য হবে না। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হেরাক্লিয়াস আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন ও পারসিয়ানদের একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করেন । (টীকা ৫৬)

৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে রোমান ও পারসিয়ানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। বর্তমান ইরাকের বাগদাদের কাছে টাইগ্রিস নদীর ৫০ কিলোমিটার পুর্বে নাইনভিহ এর ধ্বংস্তুপের কাছে এই

যুদ্ধ হয়। এখানে রোমক বা বাইযেনটাইনিজরা পারসিকদের হারিয়ে দেয়। কয়েক মাস পর পারসিকরা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয় ও তাদের দখলে থাকা বহু এলাকা রোমানদের ফিরিয়ে দেয়। (টীকা ৫৭)

পারস্য রাজ দ্বিতীয় খসরুর বিরুদ্ধে রোমকদের জয় পরিপুর্ণতা লাভ করে যখন জেরুজালেম ও যীশুর সমাধিস্থল (**Church of the Holy Sepulchre**) আবারো খৃস্টানদের অধিকারে আসে। (টীকা ৫৮)

তাই বলা যায়, কুরআন ও রাসুল (দঃ) এর ভবিষ্যত বাণী " তিন থেকে নয় বছরের " মধ্যে রোমানদের বিজয় অলৌকিকভাবেই সত্যে পরিণত হয়।

ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে গেল :-

মুসলমানরা যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিযরত করেন, তখন কাফিররা মুসলমানদের জন্য মক্কায় ফেরার পথ কঠিন করে ফেলে। তারা মুসলমানদের হজ্জ ও উমরাহ পালনেও বাধা দেয়। এছাড়াও মক্কার কাফিররা মদীনার মুসলমানদের উপর একের পর এক হামলা চালাবার চেষ্টা করে। তবে তা সফল হয় নি।

হিজরতের ছয় বছর পর রাসুল (দঃ) স্বপ্ন দেখেন তিনি ও কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) ইহরাম পরে কাবার চারপাশে তাওয়াফ করছেন। সম্পুর্ণ নিরাপদ পরিবেশে তারা তাওয়াফ করছেন --- কাফিরদের তরফ থেকে কোন আক্রমণের ভয় তারা করছেন না। রাসুল (দঃ) সাথে সাথে সাহাবীদের কাছে এই ভাল স্বপ্নের কথা জানালেন।

ইসলামের জন্য মক্কার দুয়ার খুলে যাওয়ার বিষয়ে আবু মুসা থেকে আল বুখারী বর্ণনা করেন :- রাসুল (দঃ) বলেন, আমি স্বপ্নে একটি তরবারী ঘুরালাম। সেটা মাঝখান থেকে ভেঙ্গে গেল। এটি উহুদ যুদ্ধে বিশ্বাসীদের ক্ষয়- ক্ষতির প্রতীক। আমি আবার তরবারী ঘুরালাম --- সেটা আগের থেকে অনেক ভাল তরবারীতে পরিণত হলো। এটা ইসলামের জন্য মক্কার উন্মুক্তকরণ ও আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বাসীদের সমবেত করা বোঝাচ্ছে।

রাসুল (দ:) কে সাহায্য ও সমর্থন দান করে আল্লাহ কুরআনের সুরা ফাতহের ২৭ নং আয়াত নাজিল করলেন। আল্লাহ জানালেন রাসুল (দ:) এর স্বপ্ন সত্য ও আল্লাহর ইচ্ছায় রাসুল (দ:) ও সাথীরা মক্কায় ঢুকবেন ..... " নিশ্চয়ই আল্লাহ রাসুলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন : ' ইনশা আল্লাহ তোমরা অবশ্যই মসজিদ উল হারামে নিরাপদে ঢুকবে , মাথা কামাবে বা চুল কাটবে কোন ভয়- ভীতি ছাড়াই। ' তিনি জানেন যা তোমরা জানো না ; তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন এক আসন্ন বিজয় " (ফাতহ; ৪৮: ২৭)

হিজরতের ছয় বছর পর জিলকদ্দ মাসে রাসুল (দ:) ১৫০০ সাথীসহ মক্কায় রওনা হন উমরাহ পালনের জন্য। এতে মক্কার পৌত্তলিকরা রেগে যায় ও বেরিয়ে পড়ে রাসুল (দ:) কে বাধা দিতে। রাসুল (দ:) মুসলমানদেরকে নিয়ে মক্কার উত্তরে হুদাইবিয়াতে শিবির স্থাপন করেন। দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয় ও একটি চুক্তি হয়। এর ফলে মুসলমানরা অন্যান্য সুবিধার মধ্যে নিরাপদে পরে উমরাহ করার সুযোগ পায় --- যেমনটি ভবিষ্যত বাণী করা হয় সুরা ফাতহায়। তাফসীর আল জালালাইনে এই আয়াতে ব্যাখ্যা এমন ---

হুদাইবিয়ার চুক্তির বছরে রাসুল (দ:) স্বপ্ন দেখেন তিনি মক্কায় ঢুকছেন । সাথীসহ তিনি মাথার চুল কামাচ্ছেন , কেউ বা চুল ছোট করছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদের জানালে তারা সবাই আনন্দিত হোন। তাই যখন তারা রাসুল (দ:) এর সাথে বের হলেন ও হুদায়বিয়াতে কাফিরদের বাধার মুখে ফিরে আসলেন -- এটা মেনে নেয়া তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিছু মুনাফিক সন্দেহে পড়ে যায়। কুরআনে বলা হয় " তিনি জানেন যা তোমরা জানো না ও ---- আসন্ন বিজয় " --- এটা ছিল ইসলামের জন্য খাইবারের উন্মুক্তকরণ । স্বপ্ন সত্যি হয় পরের বছরেই (টীকা ৫৯)।

ইসলামের জন্য মিসর উন্মুক্তকরণ ---

আবু দার বর্ণনা করেন : রাসুল (দ:) তোমরা খুব তাড়াতাড়িই মিসর জয় করবে। এটা সেই ভুমি যার নামে কিরাত এর নামকরণ হয়েছে (টীকা ৬০) । তাই তোমরা যখন মিসর জয় করবে , তখন সেখানকার মানুষদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে (মুসলিম)।

এই হাদীসে ইসলামের জন্য মিসরের দ্বার খুলে যাওয়ার ভবিষ্যত বাণী করা হয়। যখন এটা বলা হয় , তখন রোম সম্রাট মিসর শাসন করতেন। মুসলিম বাহিনীর তখন এই ক্ষমতা ছিল না যে তারা রোমান সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করবে। রাসুল (দ:) এর ভবিষ্যত বাণী পরে সত্য হয়। তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হযরত উমর (রা:) এর সময়ে মুসলমানরা আমর ইবনে আল আস এর নেতৃত্বে মিসর জয় করে। (টীকা ৬১)

রোম ও পারস্য জয় :-

খসরু মারা যাবে ও তার পরে আর কোন খসরু থাকবে না ; সিজার মারা যাবে আর তারপরে অন্য সিজার থাকবে না ; কিন্তু তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ খরচ করবে (মুসলিম)।

'খসরু' শব্দটি ব্যবহৃত হতো প্রাচীন পারসিক রাজাদের জন্য। ' সিজার' ছিল রোমান সম্রাটদের পদবী। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কেবল বাইযেনটাইন রাজারা এই পদবী ব্যবহার করতো। রাসুল (দ:) ভবিষ্যত বাণী করেন যে এই দুই রাজার ধন- সম্পদ মুসলমানদের অধিকারে আসবে। এই ভবিষ্যত বাণীর সময় পারসিয়ান ও বাইযেনটাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের মতো শক্তি মুসলমানদের ছিল না। সামরিক , অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক -- কোনদিক থেকেই এই দুই শক্তিশালী বাহিনীর সমকক্ষতা ছিল না মুসলমানদের। পরে সব ভবিষ্যত বাণীই সত্য হয়।

উমর (রা:) যখন খলিফা হলেন , পারস্য তখন মুসলমানদের অধিকারে আসলো -- খসরুর রাজত্বের পতন ঘটলো। আবু বকর (রা:) যখন খলিফা , তখন ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তখনকার সিজার হেরাক্লিয়াসের মৃত্যুর আগে রোমদের সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা মুসলিমরা জয় করে নেয়। যেমন জর্ডান , ফিলিস্তিন , দামাস্ক , জেরুজালেম , সিরিয়া ও মিসর। অবশেষে অটোমান সুলতান ফাতিহ কনস্ট্যানটিনোপল জয় করেন ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। -- টীকা ৬২

সুলতান মেহমদ যিনি মেহমদ দি কনকারার নামে পরিচিত ছিলেন -- তিনি হাদীসের ভবিষ্যত বাণীর সত্যতা প্রমাণ করেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী ইমাম আহমেদ । ?

পুব এলাকায় রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর সিজার (কিসরা) পদবীর ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মাদ (দ:) এর সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে যা অসম্ভব মনে হয়েছিল , সেই সব বড় বড় সাফল্য মুযেজা হিসাবে আল্লাহ তাঁর রাসুল (দ:) ও উত্তরসুরীদের জন্য দান করেন।

রাসুল (দঃ) পারস্যরাজ খসরুর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করেন :-

ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসুল (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের কাছে দুত ও চিঠি পাঠান। ঐতিহাসিক সুত্র মতে , এদের মধ্যে কেউ কেউ সাথে সাথেই সেই দাওয়াত কবুল করেন। অন্যরা সত্যকে অস্বীকার করে ও মুর্তি পুজারী , মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে একজোট হয়। যে সব রাজাদেরকে রাসুল (দঃ) ইসলাম কবুলের দাওয়াত দেন , তাদের একজন হলো খসরু উপাধিধারী পারভেজ ইবনে হরমুজ।

আবদুল্লাহ ইবনে হদহাফা দুত হিসাবে খসরুর কাছে যান। কিন্তু খসরু রাসুল (দঃ) এর দাওয়াত ফিরিয়ে দেন ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেন। খসরু দু'জন দুত পাঠায় যেন মুসলমানরা তার কাছে আত্মসমর্পন করে। রাসুল (দঃ) ঐ দু'জন দুতকে ইসলামের দাওয়াত দেন। এরপর তিনি দুতদের বলেন পরদিন তিনি তাদের প্রস্তাবের উত্তর দেবেন। - টীকা ৬৩

পরদিন রাসুল (দঃ) দুতদের তাই জানান যা আল্লাহর কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন।

আল্লাহ খসরুকে নানা দু:খ- কষ্টে ফেললেন তার ছেলে শিরেভিয়ার মাধ্যমে। ছেলে তার বাবাকে খুন করবে অমুক মাসে অমুক রাতে অমুক সময়ে। (ইমার আত তাবারীর তফসীর)। রাসুল (দঃ) তাদেরকে আরো বলেন ইয়ামেনের প্রশাসক বাদহান (যে খসরুর পক্ষে বার্তাটি পাঠায়) -- তাকে বলতে যে : আমার ধর্ম ও রাজত্ব খসরুর রাজ্য থেকেও অনেক বিশাল হবে। তাকে আমার পক্ষ থেকে বলো , ইসলামে প্রবেশ করো। আমি তোমাকে তোমার যা আছে সেটা থাকার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আর আমি তোমাকে ইয়ামেনবাসীর রাজা বানাবো (আত তাবারী)।

দুতরা ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে বাদহানকে সব জানালো । পারসিয়ান প্রশাসক তখন বলে , বেশ , আমরা দেখবো এখন কী হয়। যদি সে যা বলেছে তা সত্যি হয় , তবে সে সত্যিই আল্লাহর রাসুল (দঃ)। (আত তাবারী)

এরপর বাদহান দুতদের কাছে জানতে চায় তারা মুহাম্মাদ (দঃ) সম্পর্কে কী মনে করে ? দু'জন দুতই রাসুল (দঃ)কে দেখে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিল। তারা বললো : " আমরা এরকম রাজকীয় ব্যক্তিত্ব অন্য কোন শাসকের মধ্যে দেখি নি। তিনি পাহারাবিহীন অথচ নির্ভীক ।

মুহাম্মাদ (দঃ) নম্রভাবে মানুষের সাথে চলাফেরা করেন । ”

বাদহান কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখার জন্য যে খসরু সম্পর্কে রাসুল (দঃ) যা বলেছেন তা সত্যি হয় কি না। যখন সে দেখলো সবই সত্য , তখন সে ঘোষণা দিল তার বিশ্বাস মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যিই আল্লাহর রাসুল (দঃ)। হাদীস ও অন্যান্য ঐতিহাসিক সুত্রে বলা হয় , বাদহান খসরুর ছেলের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিল -- আমি খসরুকে খুন করেছি। যখন তুমি এই চিঠি পাবে তখন সবার কাছ থেকে আমার নামে আনুগত্যের শপথ নাও। খসরু আগে যা নির্দেশ দিয়েছিল সেগুলি কোনটাই এখন করবে না যতক্ষণ আমি নির্দেশ না পাঠাই। (আত তাবারী)

চিঠি পাওয়ার পর বাদহান ও তার সাথীরা হিসাব করে মিলিয়ে দেখলো রাসুল (দঃ) যেভাবে বলেছিলেন , ঠিক সেভাবেই সব কিছু হয়েছে (টীকা ৬৪)।

এই মুযেজার পর প্রথমে বাদহান ও পরে ইয়েমেনী আবনা ইসলাম কবুল করে। (টীকা ৬৫)

বাদহান হলো প্রথম গভর্ণর যাকে রাসুল (দঃ) নিয়োগ দেন ও প্রথম পারসিয়ান গভর্ণর যে মুসলমান হয়।

<u>কিয়ামতের আলামতঃ-</u>

অদুর ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বেশ কিছু বিষয়ের ভবিষ্যত বাণী রাসুল (দঃ) করে যান। তাঁর মৃত্যুর ১৪০০ বছর পরে আমরা দেখছি অনেক কিছুই এখন ঘটছে।

আনাস ইবনে মালিক বলেন : আমি তোমাদেরকে একটি হাদীসের কথা বলি যা আমি রাসুল (দঃ) এর কাছে শুনেছি আর আমার পরে আর কেউ এটা বলবে না। আমি রাসুল (দঃ) কে বলতে শুনেছি - কেয়ামতের আলামত হলো জ্ঞান অদৃশ্য হবে ও অজ্ঞতার প্রসার হবে। ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে ; মদ খাওয়া সাধারণ ব্যপারে পরিণত হবে ; পুরুষের সংখ্যা কমবে ও নারীর সংখ্যা বাড়বে যতক্ষণ না অবস্থা এমন দাড়ায় যে এক পুরুষকে ৫০ মহিলার দেখাশোনা করতে হয় ।

আবদুল্লাহ বলেন : রাসুল (দ:) বলেছেন : কেয়ামতের ঠিক আগে আগে এমন সময় আসবে যখন জ্ঞান থাকবে না আর অজ্ঞতা দেখা দিবে চারিদিকে ; খুন অনেক বেড়ে যাবে (ইবনে মাজাহ ; বুখারী ও মুসলিম হাদীস ; আল আমাসের হাদীস)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন : রাসুল (দ:) আমাদের কাছে এসে বললেন : হে মুহাজিরদের দল ; যদি পাঁচটি জিনিষ তোমাদের মধ্যে দেখা দেয় , তবে নানাভাবে তোমরা শাস্তি পাবে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যাতে তোমরা এই অবস্থা থেকে মুক্ত থাকতে পারো ।

কোন দলের মধ্যে অশালীনতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা তারা প্রকাশ্যে নিয়ে আসে ; তাহলে প্লেগ তাদের মধ্যে দেখা দেয় ; এমন ধরণের অসুখ তাদের হয় যা তাদের আগেকার মানুষদের কখনো হয় নি। যদি তারা মাপে ও ওজনে কম দেয় , তাহলে খরা ও ভয়াবহ দু:খ দেখা দিবে ও স্বৈরশাসক তাদের উপর নেতৃত্ব করবে।

যদি তারা সম্পত্তির উপর যাকাত দিতে অস্বীকার করে , তবে তারা বৃষ্টির রহমত থেকে বঞ্চিত হবে । যদি জীবজন্তু না থাকতো তাহলে তারা একেবারেই বৃষ্টি পেত না।

যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (দ:) এর সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে , তাহলে আল্লাহ বাইরের শত্রুদের মধ্যে থেকে কাউকে তাদের শাসক বানাবেন -- যে তাদের যা আছে তা থেকে কিছু দখলে নেবে। শাসকরা যদি আল্লাহর দেয়া আসমানী কিতাবের বিধি – বিধান মেনে না চলে ও নিজ ইচ্ছামতো চলে যার ভিত্তি কুরআনে নেই , তাহলে আল্লাহ তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে দেবেন (ইবনে মাজাহ)।

১০. উপসংহার

মুযেজা হলো অসাধারণ কিছু যা ঘটানো মানুষের সাধ্যের বাইরে। এটা শুধুমাত্র আল্লাহর তরফ থেকে ঘটে। মুযেজা যে শুধু হযরত মুসা (আ:) এর সমুদ্র ভাগ করা বা হযরত ঈসা (আ:) এর অন্ধকে ভাল করে তোলার মতো দৃশ্যমান কোন ঘটনাই হবে ---তা নয়। বিভিন্ন নবী ও রাসুল (দ:) কে আল্লাহর সমর্থন দান , বিপদের সময় আল্লাহর তরফ থেকে ওহী ও সাহায্য পাঠানো --- এসব সাধারনভাবে যত ছোটই মনে হোক না কেন --- এগুলিও মুযেজা।

হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) কে বিভিন্ন ধরণের মুযেজা দান করা হয় -- যা তাঁর জীবনের সব ক্ষেত্রে ছাপ ফেলেছে। রাসুল (দঃ) কে দান করা হয় ব্যতিক্রমধর্মী এক মুযেজা---- বায়তুল মুকাদ্দাসে রাত্রিবেলা সফর ও সাত আকাশে ভ্রমণ। এই মুযেজা কেউ চোখে দেখে নি , তবে বিভিন্ন ঘটনা দিয়ে প্রমাণিত যা বিশ্বাস করতে মানুষ বাধ্য হয়।

রাসুল (দঃ) কে কিছু দৃশ্যমান মুযেজা দান করা হয় যেমন আঙুল থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া -- যা সেই সময়ে বহু লোকজন দেখেছে। এছাড়া , রাসুল (দঃ) কে ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়।

আল্লাহ শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর রাসুল (দঃ) কে নানাভাবে সাহায্য করেন। এক কথায় , রাসুল (দঃ) এর জীবন ও চরিত্র , কথা ও প্রার্থনা --- সব কিছুই ছিল অনন্য ও রহমতে ভরপুর। রাসুল (দঃ) এর জীবনের মুযেজাগুলি যেমন ছিল বিচিত্র রকমের , সেগুলি ঘটার কারনও ছিল বিভিন্ন। কিছু মুযেজা ঘটে মুসলমানদের দৃঢ় রাখা ও তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দুইভাবেই শক্তি , সাহস ও উৎসাহ দেয়ার জন্য। এর একটি উদাহরণ হলো বদরের যুদ্ধে আল্লাহর তরফের সাহায্য। কিছু মুযেজা ঘটে শত্রুর হাত থেকে রাসুল (দঃ) কে বাঁচানোর জন্য।

এটি ঘটে ওহীর মাধ্যমে কাফিরদের ষড়যন্ত্র রাসুল (দঃ) এর কাছে জানানো থেকে শুরু করে দৃশ্যমান সাহায্য যেমন গুহায় মাকড়সার জাল বোনার মাধ্যমে ---যখন রাসুল (দঃ) সাথীসহ কাফিরদের থেকে পালিয়ে ছিলেন। অন্য কিছু মুযেজা ঘটে এটা প্রমাণ করতে যে মুহাম্মাদ (দঃ) সত্যবাদী। তাই তিনি যা বলছেন তাঁর সমর্থনে কিছু মুযেজা ঘটানো হয় যেমন গাছ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ এক ও মুহাম্মাদ (দঃ) আল্লাহর রাসুল (দঃ) ।

অনেক সময় মানুষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মুযেজা দান করা হয়। মক্কার লোকেরা রাসুল (দঃ কে মুযেজা দেখাতে বললে আল্লাহর আদেশে রাসুল (দঃ) অঙুলি হেলনে চাঁদ দুই টুকরো হয়। মুযেজার কারণে কিছু মানুষ সত্য পথে আসে , কিছু মানুষ রয়ে যায় কঠিন মন নিয়ে। তারা আল্লাহর এসব নিদর্শনকে যাদুবিদ্যা বলে। এটা আল্লাহর ইচ্ছা যে তিনি চাইলে এমন মুযেজা দেখানো যেতো যাতে সবাই বিশ্বাস আনে।

“ আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে এমন এক নিদর্শন পাঠাতে পারতাম , যার সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যেতো (সুরা আস শু’আরা ;২৬ : ৪)

কিন্তু তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে যে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন ---সেটা তার বিরোধী হতো। কেননা , আল্লাহর দেয়া জ্ঞান- বুদ্ধি দিয়ে আমরা বিচার করি কোনটা ঠিক , কোনটা ভুল । মুযেজা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ও কাফিরদের মধ্যেকার পার্থক্যকে প্রকাশ করে দেয়-- কে স্রষ্টায় বিশ্বাসী আর কে সত্য প্রত্যাখানকারী --- মুযেজার মাধ্যমে তার প্রমাণ হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেন বিশ্বাসীরা কিভাবে উত্তর দিয়েছিল

“ আপনি মহান পবিত্র ; আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বেশী আমরা কিছুই জানি না। আপনি মহাজ্ঞানী , প্রজ্ঞাময়। ” (বাকারা; ২:৩২)

---এবং যারা প্রত্যাখান করে :-

“ তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে , তখন তাচ্ছিল্য করে হাসে । বলে : এতো শুধু এক জাদু ” (সুরা সাফফাত; ৩৭ : ১৪-১৫)

সব রাসুলকে দেয়া মুযেজাই গুরুত্বপুর্ণ। তবে হযরত মুহাম্মাদ (দ:) কে দান করা মুযেজা একটি বিশেষ বিবেচনায় আলাদা -- রাসুল (দ:) এর মুযেজা অনেক বেশী মানুষ দেখেছে।

মুসা (আ:) ও ঈসা (আ:) এর মুযেজাগুলি শুধুমাত্র তাঁদের সময়ের মানুষ দেখেছে। কিন্তু রাসুল (দ:) যে মুযেজাগুলি লাভ করেছিলেন , সেগুলি এমন কী তাঁর মৃত্যুর পরেও মানুষ দেখেছে। যেমন সাহাবীদের শহীদ হওয়ার ভবিষ্যত বাণী ও কিছু এলাকায় বিজয় লাভ। অবশ্য সবচেয়ে স্থায়ী মুযেজা হলো --- যা লক্ষ কোটি মানুষ সারা দুনিয়ায় যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছে --- তাহলো পবিত্র কুরআন। নানা দিক থেকেই কুরআন অলৌকিক --- যেভাবে এটা নাজিল হয়েছে , যেভাবে এটা সংকলিত হয়েছে ও যেভাবে এটা সংরক্ষিত হয়েছে --- সবই অসাধারণ।

রাসুল (দ:) আমাদের জন্য অলৌকিক কুরআন রেখে গিয়েছেন ঠিক সেভাবেই --যেভাবে এটা তাঁর কাছে নাজিল হয়েছিল। আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন ; একজন তাই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে এই মুযেজা পাঠ করবে ও কুরআনের আদর্শকে গ্রহণ করবে অথবা ত্যাগ করে এই মুযেজাকে অস্বীকার করবে

“ যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তাদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে তা তেলাওয়াত করে , তারাই কুরআনে বিশ্বাস আনে । যারা অস্বীকার করে , তারাই তো ক্ষতিগ্রস্থ (বাকারা ; ২: ১২১)

“ তারা (ফিরিশতারা) বলে : আপনি মহান পবিত্র ; আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তার বেশী আমরা কিছুই জানি না। আপনি মহাজ্ঞানী , প্রজ্ঞাময়। ” (সুরা বাকারা; ২:৩২) ।

টীকা :

1 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 298

2 *Ibid*., p. 300

3 'Mu'allaqat': http://www.britannica.com/eb/article-9054111

4 Ahmet Cevdet Pasa, Muallim Mahir iz, *Peygamber Efendimiz (sav)* (Our Prophet [saas]), Izmir, Isik Publications, 1996, pp. 55-56

5 Bediuzzaman Said Nursi, *Risale-i Nur Collection*, "The Letters: The Nineteenth Letter, Eighteenth Sign, Second Remark", http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/letters/19letter.html

6 *See Perished Nations*, Harun Yahya, Ta-Ha Publishers Ltd., 2002

7 Bediuzzaman Said Nursi, *Risale-i Nur Collection*, "The Letters: The Twenty-sixth Letter, The First Topic", http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/words/15th_word.htm

8 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 237

9 *Ibid.*, p. 238
10 *Ibid.*, p. 237

11 *Ibid.*, p. 286
12 Imam al-Ghazali, *Ihya Ulum-ud-din* (Revival of the Sciences of the Deen), trans. by Sitki Gulle, Huzur Publishings, Istanbul, 1998, pp. 795-796

13 Imam al-Ghazali, *Ihya 'ulum ad-din* (Revival of the Sciences of the Deen), vol. II, English Translation by Fazlul Karim, Islamic Book Services, New Delhi, 2001, p. 252

14 Afzalur Rahman, *Encyclopaedia of Seerah: Muhammad (saas)*, Inkilap Publishing, Istanbul, 1996, p. 162

15 Imam Sa'id Hawa, *al-Asas fi't-Tafsir* (The Basics of Qur'anic Commentary), Samil Yayinevi, Istanbul, 1991, p. 332

16 Omer Nasuhi Bilmen, *Ku'ran-i Kerim'in Turkçe Meali* (Tafsir of the Qur'an), vol. 2, Bilmen Basim ve Yayinevi, Istanbul, pp. 1101-1102

17 Ibn Kathir, *Tafsir of Qur'an with Hadiths*, vol. 9, Istanbul, Cagri Publications, 1996, p. 4623

18 *Ibid.*, p. 4615
19 Ilyas Celebi, *Itikadi Acidan Uzak ve Yakin Gelecekle Ilgili Haberler* (Faith-Related Prophecies for the Far and Near Future), Istanbul, 1996, p.161

20 Bediuzzaman Said Nursi, *Risale-i Nur Collection*, "The Letters: The Nineteenth Letter, Seventeenth Sign", http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/letters/19letter.html
21 *Ibid.*, http://www.risale-inur.com.tr/rnk/eng/letters/19letter.html

22 Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, *Muhammad Messenger of Allah Ash-Shifa*, trans. Bewley, Madinah Press Inverness, Scotland, 3rd print, 1999, p. 165
23 *Ibid.*, p. 167

24 *Ibid.*, p. 168
25 *Ibid.*, p. 158
26 *Ibid.*, pp. 158-159

27 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 536

28 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 535
29 Qadi 'Iyad Ibn Musa al-Yahsubi, *Muhammad Messenger of Allah Ash-Shifa*, p. 161

30 *Ibid*., pp.163-164

31 *Ibid*., p. 162
32 *Ibid*., p. 162

33 Ibn Kathir, *The Virtues and Noble Character of the Prophet Muhammad (saas)*, Istanbul, Celik Yayinevi, 1982, p. 325

34 *Ibid*., pp. 316, 327
35 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 851
36 *Ibid*., p. 854
37 *Ibid*., p. 856

38 Afzalur Rahman, *Encyclopaedia of Seerah: Muhammad (saas)*, vol. III, Inkilap Publishing, Istanbul, 1996, p. 104
39 Shaykha Anne Khadeijah Darwish and Shaykh Ahmad Darwish, *The Millennium Biography of Muhammad (saas) The Prophet of Allah*, www.Allah.com

40 According to documents from Islamic and historical sources the Prophet left his home in the 14th year after becoming a prophet on the 27th day of the month of Safar (the second Arabic lunar month)
41 Omer Nasuhi Bilmen, *Ku'ran-i Kerim'in Turkçe Meali* (Tafsir of the Qur'an), vol. 3, Bilmen Basim ve Yayinevi, Istanbul, p. 1270

42 *Tafsir Ibn Kathir*, abridged by Sheikh Muhammad Nasib Ar-Rafa'i, Al-Firdous Ltd., London: 2002, pp.145-146; hadith from Musnad Ahmad, Sahih al-Bukhari: 3653 and Sahih Muslim: 2381

43 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, p. 316

44 Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Cagri Yayinlari, Istanbul, 1991, p. 3318

45 Omer Nasuhi Bilmen, *Ku'ran-i Kerim'in Turkce Meali Alisi ve Tefsiri* (Tafsir of the Noble Qur'an), vol. 1, Bilmen Publishings, Istanbul, p. 451
46 Ibn Kathir, *Tafsir of Qur'an with Hadiths*, vol. 7, Istanbul, Cagri Publications, 1993, p. 3447

47 Sa'id Hawa, *al-Asas fi't-tafsir* (The Basics of Qur'anic Commentary), Samil Yayinevi, Istanbul: 1991, vol. 2, p. 444

48 As-Suyuti, *Tahdhib al-khasa'is al-nabawiyyah al-kubra* (The Awesome Characteristics of the Prophet [saas]), Iz Publication, Istanbul, 2003, pp. 688-689

49 *Ibid*., p. 690
50 *Ibid*., p. 1115
51 *Ibid*., p. 1120
52 *Ibid*., p. 1120
53 *Ibid*., p. 1120

54 ***Ibid*****., p. 1121**

55 "Heraclius;" http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius

56 "Heraclius 610-641;" http://fstav.freeservers.com/emperors/heraclius.html

57 Warren T. Treadgold, ***A History of the Byzantine State and Society*****, Stanford, California, Stanford University Press, 1997, pp. 287-299**

58 http://web.genie.it/utenti/i/inanna/livello2-i/mediterraneo-1-i.htm; http://impearls.blogspot.com/2003_12_07_impearls_archive.html; http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclius

59 ***Tafsir al-Jalalayn*****, Faith Enes Publishing, İstanbul, 1997, vol. III, p. 1843**

60 The people of knowledge say that the qirat is a sub-division of a dinar or a dirham

61 "The Arab Conquest of Egypt;" http://www.nationmaster.com/encyclopedia/History-of-early-Arab-Egypt

62 "Fatih" means literally "Opener", just as "fath" means "opening", i.e. the opening to Islam.

63 "Chosroes II, Siroes, and Prophet Muhammad (628 CE);" http://www.cyberistan.org/islamic/chosroes.html

64 Salih Suruç, ***Kainatin Efendisi Peygamberimizin Hayati*** **(The Life of the Prophet [saas]), Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p. 225**

65 "Chosroes II, Siroes, and Prophet Muhammad (628 CE);" http://www.cyberistan.org/islamic/chosroes.html

66 Salih Suruç, ***Kainatin Efendisi Peygamberimizin Hayati*** **(The Life of the Prophet [saas]), Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p. 225**